আইল্যার গ্রাসে

– সুফিয়া বেগম

বয়স তখন কতো হবে। বড় জোর নয় কি দশ। নানির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি এক পৌষে। হাড় কাপানো শীতে গ্রামের বাড়ি বেড়ানোর মজাই আলাদা। চারপাশে নবান্নের উৎসব আর পিঠা পায়েসের মৌ মৌ গন্ধে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। এরই মধ্যে নানির বাড়ির আশপাশের সমবয়সী বেশ কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে গেল। দেখলাম, তারা খুব সুন্দর করে পেচিয়ে শাড়ি পরে। রঙ বেরঙ–এর শাড়ির সঙ্গে লাল–নীল ফিতায় ফুল তুলে বেণী দুলিয়ে তারা কি সুন্দর এক্কা–দোক্কা খেলে। সেই দৃশ্য দেখে আমার ভেতরটায় এক ধরনের ভালোলাগার সুখ তরঙ্গ খেলে যায়। আমারও শখ হলো। সে রকম শাড়ি আমারও একটা চাই। মাকে জানাতেই মা বারণ করলেন। শাড়ি পরে ঠিক মতো হাটতে, চলতে না পেরে কখন, কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি তার ঠিক নেই। শেষে হাত পা না ভেঙে যায়।

কিন্তু আমার ভেতরের অদম্য ইচ্ছা কিছুতেই থামার নয়। নানির শরণাপন্ন হলাম। নাতনির এই সামান্য আবদার নানি পূরণ না করেই পারে না। পরদিন হাট থেকে আমার জন্য ছয় হাত বাই দুই হাত একটা লাল–নীল চেকের শাড়ি আনা হলো। সঙ্গে রঙিন ফিতাও। আমার আর তর সইছে না সকালের অপেক্ষায়। রাতেই শাড়িটা পেচিয়ে পরে ফেললাম। নানি বললেন সকালে চুল বেণী করে ফিতা দিয়ে ফুল তুলে দেবেন। কিন্তু বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে রাতটা অসম্ভব লম্বা। ছটফট করছি কখন ভোর হবে। আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। বেণী দুলিয়ে তাদের সঙ্গে এক্কা–দোক্কা খেলবো। মনে মনে এসবের জাল বুনতে বুনতে এক সময় ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

প্রতিদিন নানির ঘুম ভাঙতো ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে। আমি সজাগ হলেও লেপের নিচে চোখ বুজে পড়ে থাকতাম। শীতের এই সকালে গরম বিছানায় শুয়ে থাকার মতো সুখ বুঝি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। শুয়ে শুয়ে সব টের পেতাম আমি। নানি ফজরের নামাজ সেরে আইল্যার আগুনের পাশে বসে তসবি জপতেন। ঘরের এক কোণায় ছোট্ট একটা গর্ত করে তার মধ্যে একই মাপের মাটির হাড়ি বসানো হতো। শীতের প্রতি সন্ধ্যায় এটাকে ভূষি অথবা তুষ ভরে আগুন দিয়ে রাখা হতো। সারা রাত এগুলো পুড়ে দগদগে ঘায়ের মতো আগুন হয়ে থাকতো। সকালে এটার পাশে নানি বসে থাকতেন সূর্য ওঠা পর্যন্ত। দরকারে শুকনা–পাতলা লাকড়ি ছোট টুকরো করে এর মধ্যে দিয়ে আগুনটাকে উসকে দিতেন। এটাই সেই এলাকায় *আইল্যা* নামে পরিচিত ছিল।

সেদিন ভোরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় সজাগ হয়ে আর শুয়ে থাকতে পারিনি। নানি নামাজে বসার পর পরই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দরজার ফাক দিয়ে বাইরে দৃষ্টি গলিয়ে দেখি তখনো যথেষ্ট অন্ধকার। কি আর করা! অগত্যা নানির আইল্যার পাশে বসলাম। কিন্তু আমার শহুরে আয়েশে গড়া শরীরের শীত তুষের আগুনের প্রতিরোধ মানছে না দেখে এর মধ্যে কিছু লাকড়ির টুকরো দিলাম। ফুকনি দিয়ে দুই একবার ফু দিলাম। তবুও আগুন জ্বলছে না। আরো লাকড়ির জন্য দুই পা ফাক করে দাড়িয়ে

আইল্যার অন্যপাশে হাত বাড়ালাম। অমনি ধপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই পায়ের মাঝখানের শাড়িতে ধরে গেল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই নানি সালাম ফেরাতে গিয়ে দেখে ফেললেন। দৌড়ে এসে এক কলসি পানি ঢেলে দিলেন আইল্যাসহ আমার ওপর। ততোক্ষণে আমার শখের শাড়ির বেশ কিছু ভাজ পুড়ে গেছে।

সেদিন বোকার মতো যা করেছিলাম তা মনে হলে আজো আমার হাসি পায়। এতো বড় একটা দুর্ঘটনা থেকে নিজের শরীরটা অক্ষত অবস্থায় বেচেছে সেই চিন্তা না করে শাড়ির শোকে হাউমাউ করে কাদা শুরু করলাম। এবং লক্ষ্য করলাম যে, আমার এতো কান্নায়ও কারো মন গলছে না। কেউ আমাকে আর একটা নতুন শাড়ি কিনে দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছে না। উপরন্তু মা সবাইকে শাড়িটা দেখিয়ে আমাকে আশকারা দেয়ার রাগ ঝাড়লেন। সেই যে ছাড়তে হয়েছিল শাড়ি এরপর প্রথম পরেছিলাম কলেজের একটা অনুষ্ঠানে। আজ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য শাড়ির বিকল্প কোনো পোশাক খুজে পাই না।

কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে

ইমু

মেয়েটির নাম ইমু। প্রায় দশ বছরের বন্ধুত্ব আমাদের। শাড়ি নিয়ে আজ ওর সম্পর্কে কিছু কথা লিখছি।

এক. প্রচণ্ড খেয়ালিপনার জন্য ওর মা-বোনেরা ওকে কোনো দামি শাড়ি পরতে দিতে চাইতেন না পাছে নষ্ট করে ফেলে। তখন আমরা ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। আমাদের এক বান্ধবীর বিয়েতে সবাই শাড়ি পরলাম, সঙ্গে ইমুও। অনুষ্ঠান শেষ হলো কোনো অঘটন ছাড়াই। ঘটনা ঘটলো বাড়ি ফেরার পথে। বাসা দুজনার কাছাকাছি হবার কারণে পাশাপাশি বসে রিকশায় ফিরছি। প্রথমে আমার বাসা, তাই রিকশা থেকে নামলাম বাড়ির গেটে। কিন্তু একি! আমার বান্ধবীর বুকে শাড়ির আচল কই? সে নিজেও জানে না কতোক্ষণ এভাবে আচল ফেলে বসে আছে।

দুই. এবার আমরা মাস্টার্স ফাইনালের ছাত্রী। কলেজের এক অনুষ্ঠানে সবাই শাড়ি পরেছে। সবাই ক্লাসে যখন ম্যাডামের লেকচারে মগ্ন তখনই ইমু এলো হন্তদন্ত হয়ে। দরজায় দাড়িয়ে বললো, ম্যাডাম আসবো?

ক্লাসের সব কয়টা মেয়ের চোখ পড়লো তার ওপর এবং সশব্দে হাসির জোয়ার। শাড়ি পরেছে ইমু ঠিকই কিন্তু উল্টা এমনকি আচলটাও উল্টা কাধে তার। আমরা আবারও শব্দ করে হাসলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

নীলচে কালী

– খাদিজা রিপা

আমি কোনোকালেই সুন্দরী ছিলাম না। দেখতে কালো এবং সামান্য খাটো। সে কথা আমি ফোনে এবং চিঠিতে সুমনকে জানিয়েছি। কিন্তু সুমন বলেছে যে, তবুও আমাকে দেখতে চায়। আমি রাজি হলাম।

আমার এখনো মনে আছে সেদিন একটা নীল শাড়ি পরেছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাড়িয়ে রইলাম। পাচটা বেজে গেছে। কিন্তু তার আসার খবর নেই। এদিকে আশপাশে থেকে নানান মন্তব্য ছুটে আসছে। খুব অস্বস্তি লাগছিল। প্রায় বিশ মিনিট পর সুমন এলো। তার কথা ছিল একটা কালো রঙয়ের শার্ট পরে আসবে, তাই চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু এ আমি কাকে দেখছি? সুদর্শন বললে ভুল হবে, রীতিমতো রাজপুত্র। সামনে যেতেই অমার লজ্জা লাগছিল। তখন সুমন সামনে এলো জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছো?

দেখলাম সুমন একটু গম্ভীর হয়ে আছে। সামান্য সৌজন্যমূলক কথা ছাড়া আর কিছুই বলেনি। আমাকে যে তার পছন্দ হয়নি সেটা বুঝতে আর বাকি রইলো না। ঠিক তখন পাশ থেকে এক ছেলে বলে উঠলো, *নীলচে কালী।*

সুমন ঝট করে আমার শাড়ির দিকে তাকিয়ে আমার দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ পর নানান কাজের কথা বলে চলে গেল। আমিও বাড়ি চলে এলাম।

এরপর সুমনের কোনো ফোনও আসে না, চিঠিও আসে না। এটাই স্বাভাবিক ভেবে মেনে নিলাম। কিন্তু একদিন সুমনের একটা চিঠি এলো। হন্তদন্ত হয়ে খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়লাম। চিঠিতে সুমন লিখেছে,

আমার ধারণা ছিল শাড়িতে মেয়েদের ইন্দ্রানীর মতো দেখায়। নীল শাড়ি হলে তো কথাই নেই। কিন্তু আমার ধারণার ভুল প্রমাণ হলো তোমাকে দেখে। কিছু মনে করো না, আমি সরাসরি বলছি। শাড়ি পরাতে যে মেয়েকে নীলচে কালী দেখায় শাড়ি পরা ছাড়া তাকে জানি কেমন বিশ্রী দেখাবে? আমি ভাবতেও পারছি না।

এরপর থেকে শাড়ি পরি না। শাড়ি পড়ার কথা ভাবলেই খট করে ওই নীলচে কালী শব্দটা মনে পড়ে যায়।

উত্তর মুগদা, ঢাকা থেকে

স্বপ্নের প্রাইড

– উর্মি

২০০১ সালের দশ মার্চে প্রথম হলে উঠি। আর সাগরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় পচিশ মার্চ। এলাকার বড়ভাই হিসেবে পরিচিত হতে এসেছেন। এর আগে আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না।

আমার কেন জানি মনে হয়, এলাকায় যদি সাগরকে চিনতাম তাহলে ঢাকায় আসার পর তার সঙ্গে আমার প্রেম হতো না। তারপর থেকে সাগরের সঙ্গে আমার প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো। অনেকক্ষণ আমরা এক সঙ্গে থাকতাম। সাগরকে প্রথমে আমার ভালো লাগে আর তাকে ভালোবেসে ফেলি এবং সঙ্গে সঙ্গে কথাটা আমি তাকে জানিয়ে দিই। সেও আমার প্রস্তাবে রাজি হয়। সাগর আমাকে বেশি ভালোবাসে। সে আমাকে এতো বেশি ভালোবাসে যেখানে আমার ভালোবাসা কিছুই না। তার ভালোবাসার বিশালতা, বিস্তৃতি সাগরের মতোই।

আমাদের প্রেমটা ঘটা করে সবাইকে জানানো হয় চব্বিশ এপ্রিল। অর্থাৎ এটাই ছিল আমাদের ভালোবাসার মূল দিন, ভালোবাসার দিবস। ২০০২ সালের ভালোবাসা দিবস পালন করার জন্য সাগর আমাকে পাবলিক লাইব্রেরিতে তাত বস্ত্র মেলা হয়েছিল সেখান থেকে একটা শাড়ি কিনে দেয়। শাড়ি কিনতে যাওয়ার পর অনেক কিছুই হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আমি কিনবো না, সে নাছোড়বান্দা কিনতেই হবে। অনেক রাগ, অভিমান, প্রচুর হাটাহাটি এমনকি দৌড়াদৌড়িও হয়েছিল। মেলাতে আমাকে রেখে সাগর হারিয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে ছিল সাগরের খালাতো ভাই সুজন। অনেক খোজাখুজির পর তাকে লাইব্রেরির সিড়িতে পাওয়া গেল। সে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

যাই হোক। শাড়ি একটা সে কিনলো। যে দামে কেনার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি টাকার শাড়ি সে কিনেছিল। শাড়িটা পরবো চব্বিশ এপ্রিল। খুবই সুন্দর, সবারই খুব পছন্দ।

সব সময় আমাকে সাগর বলে, তোমাকে আমি কোনোদিন দামি শাড়ি কিনে দিতে পারবো না। তোমাকে সব সময় *প্রাইড*–এর শাড়ি পরতে হবে।

আমি তার প্রতিটি কথায় একমত। আমাকে সাগর যেটা বলে সেটা শুনতে সব সময়ই চেষ্টা করি। তবে বেশি ভুল আমি করি। আমিই তাকে প্রচুর কষ্ট দিই। আমার শাড়িটা ছিল গোলাপি (ভালোবাসার রঙ) তার পাড়টা ছিল আকাশি রঙয়ের এবং শাড়িতে অনেক কাজ করা ছিল। শাড়িটা প্রাইডেরই ছিল। তারপর শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ এবং পেটিকোট বানালাম। কিন্তু আমার জুতা নেই। জুতা কিনতে হবে নিউ মার্কেট থেকে। পাচশ টাকা দিয়ে জুতা কেনা হলো, সঙ্গে আরো অনেক কিছুই। শাড়িটা আমি খুবই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম।

এপ্রিল মাসের আঠার তারিখ থেকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। এবং আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল চব্বিশ তারিখে আমি শাড়িটা পরতে পারবো না। কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম শুধু সাগরের ভালোবাসা আর যত্নের জন্য। চব্বিশ তারিখে যখন শাড়িটা পরবো ঠিক তার কয়েক মিনিট আগে আমার মামা আমাকে ফোন করে বলেন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আমাকে গেটে দাড়াতে, আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

মামা আমাদের ব্যাপারটা জানেন। তাই বলে মামাকে আমি সব কিছু জানাতে পারি না! সাগর গেটে আসবে ছয়টায়। এরপর মামাকে ফোন করি এবং আটটায় গেটে আসতে বলি। অনেক বোঝানোর পর মামা রাজি হন।

শাড়িটা পরে গেটে যাই। তারপর বেশ কিছু ছবি তোলা হয়, কেক কাটা হয়। অনেক আনন্দ করি। সব কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছিল কিন্তু মনের ভেতর বার বার মামা আসবে, মামা আসবে বলে ঘড়িটা টিকটিক করছিল। তাড়াতাড়ি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

শাড়ি চেঞ্জ করে আমি আর সাগর মামার জন্য গেটে অপেক্ষা করি। কিন্তু মামা আর আসেননি। শাড়িটা আমি হয়তো আর কোনোদিন পরবো না। এই অল্প সময় পরেও আমি মামা আতঙ্কে ছিলাম। তাই শাড়িটা পরার আনন্দটা কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।

সাগরের দেয়া এই শাড়িটা আমার সেই ছোটবেলা থেকে দিয়ে আসা স্বপ্নের মতো। এখন এই স্বপ্নটা আমাকে আরো বেশি আনন্দ দেয় সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও। স্বপ্নটা আমার থাক। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সাগরকে কিছুই দেইনি। সেই মুহূর্তে দিলে সে রাগ করতো। সাগরের মনে ভালোবাসা দিয়ে ঝড় তুলতে চেয়েছিলাম। জানি না পেরেছিলাম কি না। এখন যদি না পারি তাহলে হয়তো আর কোনোদিন পারবো না। তবে সমস্ত আত্মা দিয়ে চেষ্টা করবো।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

ছবি

– মোহাম্মদ মাহমুদুর

পড়ালেখা শেষ করার পর দীর্ঘ এগারো বছর প্রবাসে ব্যাচেলর জীবনও এক সময় প্রচণ্ড একঘেয়েমী মনে হতে লাগলো। তাই বাড়ির গুরুজনদের চিঠির সাড়া দিয়ে এক শুভদিনে আর দশজন সউদি প্রবাসীদের মতো সুটকেস ভর্তি বাজার নিয়ে দেশের উদ্দেশে প্লেনে চড়লাম।

হায়! বিধি বাম। সউদি প্রবাসী যারা বিদেশে পরিবার আনার অনুমতি নেই তাদের বিয়ের বাজার দর আর আওয়ামী সরকারের শেয়ার বাজারের অবস্থা একই রকম। ঘটকরূপী দালালরা আমার স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি ও মাসিক বেতন শুনে আমার গ্রেড অনেক উপরে উঠালেও অল্প দিনে প্রবাসে পরিবার না আনতে পারার দোষে আমার গ্রেড মহল্লার মুদি দোকানদারের নিচে অবস্থান করতে লাগলো।

পাত্রীর দুলাভাই যদি পাসপোর্ট দেখতে চাইতো, পাত্রীর মামা যে কম্পানিতে চাকরি করে তার টেলিফোন নাম্বার চায়।

পাত্রীর বৃদ্ধা দাদি জিজ্ঞাসা করেন প্রবাসে আবার কোনো সংসার আছে কি না। পাত্রীর চাচা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে চুলের রঙ আসল, না কলপ করা। এদিকে ছুটিও শেষ হওয়ার পথে। কিন্তু আমার গুরুজনরা নাছোড়বান্দা। অবশেষে এক বৃষ্টিভেজা দুপুরে এক চন্দ্রমুখীর সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলাম।

সব মানুষের মতো আমার সেই কাঙ্ক্ষিত রাত সমাগত। ধীরে ধীরে সকলে বাসর ঘর থেকে বিদায় হলো। অথচ বৌ ফ্রেশ হওয়ার জন্য টয়লেটে গেছে তো গেছেই। এক সময় বের হলো। তবে শাড়ি পড়া বৌ না, থ্রি–পিস পড়া কিশোরী। কারণ প্রথম শাড়ি পরেছে বলে সামলাতে পারছে না। তাই এই পরিবর্তন।

কি আর করা! অনেক তপস্যার পর জীবনসঙ্গী মিলেছে। শাড়ি আর থৃ-পিসে কি এমন তফাত? তবে চিন্তায় পড়ে গেলাম আগামীকাল যদি থৃ-পিস পরার বাহানা ধরে তখন কি অবস্থা হবে? সকালে যখন চুড়ির রিনঝিন শব্দে ঘুম ভাঙলো তখন চোখ খুলে তো অবাক! নববধূ ড্রেসিং টেবিলের সামনে শাড়ির কুচি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

আয়নায় চোখে চোখ পড়তেই খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, এই, আমার শাড়ির কুচিটা একটু ধরো তো, একা পারছি না।

শাড়ির কুচি ধরবো, না জলে সিক্ত বৌ-এর মুখের দিকে তাকাবো। নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করার জন্য থৃ-পিস পরতে বললাম।

বৌ অভিমানের সুরে বললো, সকাল সকাল থৃ পিস পরা নতুন বৌ দেখলে সবার চোখ কপালে উঠবে। হ্যা হয়েছে, কুচি ছাড়ো, পায়ে সুড়সুড়ি লাগছে।

ভাবীদের বললাম। তাদের একই কথা, কখন কে বৌ দেখতে আসে, আপাতত শাড়ি পরুক।

অবশেষে এক সময় ছুটি শেষ হলো। এয়ারপোর্টে একা পেয়ে বৌ-এর অভিযোগ, দেখ তো কয়জনা শাড়ি পরা আছে?

কর্মক্ষেত্রে সেই পুরনো এবং একঘেয়েমী জীবন শুরু হলো। কিছুদিন পর নতুন হাতে গোটা অক্ষরের ঠিকানা লেখা চিঠি পেলাম। বৌ-এর প্রথম চিঠি। চিঠির উত্তরে কিছু পাঠানো দরকার। কিন্তু কখন যে শাড়ি কিনে ফেলেছি খেয়াল নেই। কি আর করা! পোস্ট করে দেশে পাঠালাম।

চিঠির উত্তরে বৌ শাড়ি পরা ছবি পাঠিয়েছে। পেছনে লেখা, *এখন আমি একা শাড়ি পরতে পারি।*

দাম্মাম, সউদি আরব থেকে

পারিবারিক

– মোহাম্মদ মিনার

বাবা যেমন ছিলেন বদমেজাজি তেমন ছিলেন রসিক। বিশেষ করে আমার আধবুড়ো মায়ের সঙ্গে যেমন ঠাট্টা মশকারা করতেন তাতে আমাদের কিশোর মনেও দাগ কাটতো। এখন অবশ্য বুঝতে পারছি মায়ের ওপরে সব রকম হক আছে বাবার। আমার বাবাকে আজরাইল হিসেবেই মা মনে করেন। বাবা রেগে গেলে ঠেকায় কে? এ যুগের ভিলেন ডিপজলের চেয়েও বাবা ক্ষেপে উঠতেন। যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দিতেন। প্রায় সময় হাল চষা লাঠি দিয়ে মাকে আদর করতেন আর মা আমার বেহেশতে যাওয়ার আশায় মুখ বুজে স্বামীর মার খেতেন এবং জমিনে পড়ে কাতরাতেন।

একদিনের ঘটনা। বাবা বাজার থেকে মায়ের জন্য একটা লাল টুকটুকে শাড়ি নিয়ে এসেছেন। শাড়ির থলে মায়ের হাতে দিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, শাড়িটা তোমার জন্য, কেমন হবে, পছন্দ হয়েছে তো?

মা শাড়ি দেখার আগেই তড়িঘড়ি বলে দিয়েছেন, হ্যা, খুব ভালো হয়েছে।

যাক, বাবা খুশি হলেন। মা এবার শাড়ির প্যাকেট খুলে দেখে লাল টুকটুকে শাড়ি। যেটা মায়ের নাতনি প্রীতিও পরতে চাইবে না। যাক, তবুও বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। শাড়িটা নিয়ে মা রান্নাঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের নিতুখালা মায়ের শাড়ি দেখতে চাইলেন। মা আমার মনটা ভার করেই শাড়িটা নিতুখালার সামনে ধরলেন। আর অমনি নিতুখালা ঠোট বাকা করে বললেন, এমন লাল শাড়ি তোমার মানাবে না। মায়ের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন শব্দ করেই বলে ফেললেন, সে কি শাড়ি চেনে যে মানানসই শাড়ি কিনবে।

আর যায় কোথায়! বাবার কানে এই শব্দ পৌছে গেছে। বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে রাক্ষসের মতো মায়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। শালি বলে কি, আমি শাড়ি চিনি না...?

শাড়িটা চুলার মধ্যে দিয়ে অনবরত লাঙলা লাঠি দিয়ে মাকে পেটাতে লাগলেন। দ্বিপ্রহরে প্রহারের মাধ্যমে কিছুক্ষণের জন্য মাকে বেহুশ করে দিলেন। সেদিন বাবার নির্মম ও বর্বর আচরণ চরমভাবে আমার মনে দাগ কাটলো।

সময়ের সীমা পেরিয়ে সংসারের দায়িত্ব যখন আমার ওপর পড়লো তখন একদিন মায়ের জন্য শাড়ি কিনতে বাজারে গেলাম। সাত আটটা ভালো মানের শাড়ি পছন্দ করে নিলাম এবং পরিচিত দোকানদারকে বললাম, যে শাড়িটা পছন্দ হবে সেটা নিয়ে বাকিগুলো ফেরত দেবো। সেই সঙ্গে মায়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমার বৃদ্ধ বাবার জন্য শস্তা লাল রঙের একটি লুঙ্গি নিলাম, বাবা যাতে মোটেও পছন্দ না করেন। বাড়ি ফিরে দেখি, বাবা–মা এক ঘরে বসে পান চিবুচ্ছেন। খুব ভালো সুযোগ। বাবা–মায়ের সামনে বসে সব শাড়িগুলো মেলে দিলাম। মাকে বললাম, মা যেটা আপনার পছন্দ হবে সেইটা নেবেন। বাবার হাতে আসা ত্রিশ বছর পর মা আমার আজ স্বাধীনভাবে পছন্দ করার সুযোগ পেলেন। মায়ের চোখে মুখে আনন্দের ফুলকি ঝরছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত সুখগুলো আমার মায়ের কাছে। কিন্তু না, মা নিজে পছন্দ করলেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন শাড়িটা নেবো, বলো না?

বাবা বললেন, আজকে তোমার পছন্দই আমার পছন্দ।

এরপর বাবার লুঙ্গিটা বের করে বললাম, বাবা, এটা আপনার জন্য, পছন্দ হয়েছে তো?

এই প্রথম বাবাকে কিছু কিনে দিলাম। বাবা আমার আনন্দে আত্মহারা। আমার মাথায় হাত দিয়ে বাবা দোয়া করলেন আর বললেন, খোকা, তোর দেয়া জিনিস আমি পছন্দ না করে থাকতে পারি? খুব পছন্দ হয়েছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাবার আনন্দ মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি হেরে গেলাম। সত্যিই বাবা, আমার বাবা।

দুই.

ভাইয়ার রাগের তাপমাত্রা দেখেই বোঝা যায়, বাবার রক্তের গ্রুপ আর ভাইয়ার রক্তের গ্রুপ হুবহু মিল হবে। তাই ভাবীও মায়ের পথ অনুসরণ করেই চলেন। ভাবীর সাহস করে মুখ ফুটে ভাইয়ার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার অবকাশ নেই। সেদিন মনে হয় রাতের বিশেষ মুহূর্তে ভাবী ভাইয়ার কাছে একটা

কুছ কুছ হোতা হ্যায় শাড়ির দাবি করেছিলেন। তাই বুঝি ভাইয়া ওই দাবি উপেক্ষা না করে আজ ভাবীকে একটা কুছ কুছ হোতা হ্যায় শাড়ি কিনে দিলেন।

মাগরিবের আজান চলছে। ভাইয়া দ্রুত পাড়া থেকে বাড়ি ফিরছেন। দূর থেকে হঠাৎ করে ভাইয়া থমকে দাড়ালেন। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। চোখটা মুছে নিয়ে আবার দেখলেন, হ্যা, সত্যিই কুছ কুছ হোতা হ্যায় শাড়িটা পরে ভাবী পাশের বাড়িতে সাদিকভাইয়ের সঙ্গে চুমোচুমি করছেন।

কট্টরপন্থী ভাইয়া আমার ক্ষেপে উঠলেন। মাথায় আগুন ধরে গেছে। তাদের হাতে–নাতে ধরার জন্য ভাইয়া পাশের বাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে এসে দেখে সাদিকভাই একা টিউবওয়েলের ধারে দাড়িয়ে আছেন। কোনো কথা নয়, দ্রুত বাড়ি এসে দেখে ভাবী রান্নাঘরে। আর যায় কোথায়, চুলের মুঠি চেপে ধরে ভাবীর পিঠে ব্যান্ড সঙ্গীতের বাজনা শুরু করে দিলেন। ভাবী আমার আইয়ূব বাচ্চুর মতো নাড়ি ছেড়া চিৎকার দিতেই পাড়া–প্রতিবেশীরা ছুটে এলো। ভাইয়া তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক। অনবরত যুদ্ধ চালাচ্ছে আর মুখে বলছে, শালী, কুছ কুছ হোতা হ্যায়।

কয়েকজন মিলে হিটলারের মতো ভাইয়ার হাত থেকে ভাবীকে কেড়ে নেয়া হলো। ভাইয়া এবার চোখ তুলে তাকাতেই দেখে, আমাদের সাদিকভাইয়ের বৌ হুবহু ভাবীর মতো কুছ কুছ হোতা হ্যায় শাড়ি পরে আছে। ভাইয়া কেমন যেন চমকে উঠলেন। ভাইয়ার বুঝতে বাকি রইলো না, ভাবীর কোনো দোষ নেই। ভাইয়া ওই সময় শরিয়ত মতোই ভাবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

সাফাত, কুয়েত থেকে

অভিভূত

– শাহ আলমগীর

শাড়ির কারণেই জীবনের চাকা ঘুরে গেল অন্যদিকে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এগুলো সরাসরি আল্লাহই নির্ধারণ করে রাখেন। কিছু কারণে মানুষ সেগুলো স্মরণ করে বার বার। সেদিন তার বড় বোনের বিয়ে। আত্মীয়ের খাতিরে নিমন্ত্রণটা আমারও ছিল। বিয়েতে হাজির হলাম একটা লাল রঙয়ের পৃন্টের সিল্ক শাড়ি নিয়ে। অনুষ্ঠানাদি শেষ করে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম। মূল ঘটনা ঘটলো পরদিন। যখন পৌছালাম, তাদের বাড়িতে ঘরের একটি রুমে বান্ধবীসহ বসে আছে সে। আমারই প্রেজেন্ট করা লাল শাড়িটা পরে। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধুও ছিল তখন। দেখামাত্রই আমার হৃদয়ে ভালোলাগার হাওয়া বইতে শুরু করলো। অন্য রকম এক ভালোলাগা আমার সমস্ত মন, অন্তকরণ ছুয়ে গেল। অভিভূত হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। বন্ধুটির ছোয়ায় সংবিৎ ফিরে পেলাম।

খালি চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলাম তার। বললাম, অপূর্ব।

সে জিজ্ঞাসা করলো, কি?

উত্তর দিলাম না।

বান্ধবীরা বললো, পাগল নাকি।

মনে মনে বললাম, সত্যিই আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। তারপর স্থির করলাম জীবনের সঙ্গী হিসেবে তাকেই আমার চাই।

বাবা–মা পাত্রী দেখতে শুরু করলেন। তাদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে আমিও দুই একটা মেয়ে দেখতে গেলাম সবার সঙ্গে। কিন্তু যতো সুন্দরীই দেখি না কেন, বার বার তার প্রতিচ্ছবি আমার সামনে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিছুতেই তার চেহারা ভুলতে পারছি না। জানি পরিবারের অমত আছে সেখানে। তাই ভয়ে বলতেও পারলাম না। এভাবে কিছু দিন কেটে গেল। কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সুযোগ বুঝে একদিন মাকে ইনিয়ে–বিনিয়ে কথাটা বলেই ফেললাম। প্রথমত. মা রাজি না হলেও পরবর্তী সময়ে রাজি হয়ে গেলেন। মা–ই দায়িত্ব নিলেন বাকি সবাইকে রাজি করানোর। এর সপ্তাহ খানেক পর মা সফল হলেন তার মিশনে। আর আমি পেয়ে গেলাম লাল শাড়ি পরা আমার স্বপ্নের রানীকে। একটি লাল শাড়ি আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। প্রতিনিয়ত আমি লাল শাড়ির কাছে কৃতজ্ঞ।

সউদি আরব থেকে

আত্ম উপলব্ধি

– মাসুদ

বড়আপার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মেজাজটা খারাপ হলেও বড়আপাকে কিছু বলতে পারলাম না। আপা গতকাল আমাদের বাড়িতে এসেছেন। ঘুম ভাঙার পর আপা বললেন, সুমিকে নিয়ে একটু বাজারে যেতে হবে। সে একটা শাড়ি কিনবে। কথাটা শুনে মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল। মেয়েমানুষ নিয়ে বাজারে যাবো। তার ওপর আবার শাড়ি কিনতে। এর চেয়ে যদি আজরাইল এসে বলতো, বেটা পৃথিবীতে তোর ঘুমানোর সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, তবুও এতোটা অসহায় বোধ করতাম না। আপার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। কিছু বলছি না দেখে আপা বললেন, সুমি তৈরি হয়ে বসে আছে, তুই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আয়।

আপা বের হয়ে যাওয়ার পর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে দরজা বন্ধ করে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কারণ আমার নিজস্ব রুটিনে তিনটা থেকে পাচটা পর্যন্ত ঘুমানোর কথা। এক ঘণ্টা ঘুম তখনো বাকি। কিন্তু ঘুম আসছে না। মনের ভেতরে বার বার একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে। রিকশায় সুমি আমার পাশে বসা। রাস্তার সবাই ড্যাব ড্যাব করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর বাজারে ঢুকলাম। এক দোকান থেকে আরেক দোকানে। একের পর এক শাড়ি ওলোট–পালোট করছি। তারপর পছন্দের শাড়ির ওপর দরকষাকষি ভাবতে গিয়ে আমার গা ঘেমে একাকার।

এর মধ্যে আবার দরজার বাইরে বড়আপার গলার আওয়াজ শোনা গেল। এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আমার মাথায় এলো না। সুমি বড় দুলাভাইয়ের একমাত্র বোন। বয়সে আমার প্রায় দুই বছরের ছোট। গতকাল আপার সঙ্গে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। আপার ছেলে সুমন খুব কান্নাকাটি করছে। তাই আপা বাজারে যেতে পারছেন না। সুতরাং আমাকেই যেতে হবে।

রিকশায় উঠে সুমি বললো, শাড়ি আপনাকে পছন্দ করে দিতে হবে।

কথাটা শুনে আমার মনে হলো কেউ যেন অক্টোপাসের মতো আমার গলাটা চেপে ধরেছে। অসহায়ের মতো ছটফট করছি। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো সুমনের ওপর। কি দরকার ছিল এ সুন্দর বিকেলে কান্নাকাটি করার। সেই গল্পের মতো হয়ে গেল। জনৈক ডিসি সাহেব পাচ মিনিট অফিসে লেট হয়ে নিজের নামে কেস করে দিলেন। তদন্ত শেষে এক ট্রাফিক পুলিশের চাকরি চলে গেল।

যাহোক, ছয়শ টাকা দিয়ে একটি শাড়ি কিনলাম। গতকাল পাওয়া টিউশনির টাকা প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেল। মনে মনে বললাম, সুমন, তুই আমাকে আর কতো বিপদে ফেলবি বাবা!

ছয়শ টাকার শোকে সেদিন পড়তে বসলাম না। ছাদে গিয়ে বসে থাকলাম। রাত প্রায় দশটা বাজে। চারদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। গুন গুন করে *আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে* গাওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

পেছনে পায়ের আওয়াজে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তাকিয়ে দেখি, আমার পেছনে সুমি দাড়িয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিল সুমিকে। কোনো মেয়ে শাড়ি পরলে তাকে এতো সুন্দর দেখায় তা সুমিকে না দেখলে জানতে পারতাম না। মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যের তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ। ছয়শ টাকার শোক তখন আর নেই। দুজনে দুজনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ করে সুমিকে বললাম, তোমাকে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। তোমার এই সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে দেখতে চাই।

কথাটা শুনে সুমি কিছু বললো না। তার চুপচাপ থাকাটাকে নীরব সম্মতি বলে ধরে নিলাম। আস্তে করে তার হাত ধরে একটা চুমু দিলাম। সে যেন একটু শিহরিত হলো। আবেশে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। তারপর দুই হাতে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে ঠোট দুটো তার ঠোটে রাখলাম। আমার প্রতিটি রক্তের কনিকায় ঝড় শুরু হয়ে গেল। নতুন কিছু পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মনটা ব্যকুল হয়ে উঠলো। এক সময় সুমিও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। তার সমস্ত যৌবনকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিল।

যখন সচেতন হলাম তখন দুজনেই হাপাচ্ছি। সুমি উঠে চুপচাপ এলোমেলো কাপড় ঠিকঠাক করে নিল। নিচের দিকে চোখ করে বসে ছিলাম। তখনো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারিনি। একটু পর সুমি চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, আপনি অনেক দুষ্টু হয়ে গেছেন।

পৃথিবীতে এতো সুন্দর একটি কথা থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ করে ছয়শ টাকার জন্য দুঃখ বোধ করেছি সে জন্য নিজেকে খুব ছোট মনে হলো।

মানিকদি বাজার, ঢাকা থেকে

বিড়ম্বনা

– মহুয়া

সময়টা ১৯৯৯ সাল। আমি তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। থাকতাম খালেদা জিয়া হলে। সাধারণত ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন নবীনবরণ, বিদায় অনুষ্ঠান, পহেলা ফাল্গুন, পিকনিক, এ রকম হাজারো পার্বনে মেয়েরা শাড়ি পরে থাকে। আমি ছিলাম একটু লাজুক প্রকৃতির। তাই কখনো শাড়ি পরে হলের বাইরে যাইনি।

সে যাই হোক! ফাইনাল ইয়ারের শেষ ক্লাসে আমাদের হলের সব বান্ধবী মিলে আমরা যারা একই ডিপার্টমেন্টে পড়ি তাদের সবাইকে শাড়ি পরে ক্লাসে যেতে হবে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু বাধ সাধলাম আমি। আমার কোনো কথাই তারা শুনতে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত আমাকে শাড়ি পরতেই হলো। আমরা ছিলাম চারজন। যখন আমরা শাড়ি পরে এক সঙ্গে ক্লাসে ঢুকলাম তখন ছেলেরা আমাদের করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো।

যথারীতি ক্লাস শুরু হয়ে গেল। টিচার এলেন। টিচারও একটু অবাক হয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছেন এবং রোল কল করছেন। তারপর যখন লেকচার শুরু হয়ে গেল তখন লেকচার নোট করার ফাকে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমি যেখানে বসেছি ঠিক তার সোজাসুজি বেঞ্চে বসে থাকা আমাদের চারজন ছেলে ক্লাসমেন্ট যাদের মধ্যে একজন এর আগে আমাকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়েছে সে এবং আরো তিনজন আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা ক্লাস লেকচারও শুনছে না, কিছুই করছে না। শুধু চার জোড়া চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছে। সে চোখের কোনো পলক পড়ছে না। যতোই চেষ্টা করছি তারা যা করে করুক আমি ক্লাস লেকচারে মনোযোগ দেবো কিন্তু পারছি না। ক্লাসও পৌনে এক ঘণ্টা। কি যে অস্বস্তি নিয়ে ক্লাসটা শেষ করলাম!

তার পরের ক্লাসে জায়গাবদল করলাম। তারাও আবার তাদের জায়গাবদল করে ঠিক আমার আড়াআড়ি বসলো। এভাবে আরো দুটো ক্লাস শেষ করলাম। ক্লাস শেষ করে যখন হলে ফিরছি তখন পেছন থেকে তাদের মধ্যে দইজন এসে আমাকে ডাক দিয়ে চার পাচটা গোলাপ দিয়ে বললো, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। আর এই ছয় বছর পর এক নতুন তোমাকে দেখলাম। আমাদের সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে তোমার একটা ছবি তুলে নিতাম। এবং আমরা যখন তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম তখন লজ্জা এবং অস্বস্তিতে তোমাকে আরো ভালো লাগছিল, আমরাও ভীষণ মজা পাচ্ছিলাম। এ জন্যই আমরা তোমার সঙ্গে এ রকম করছিলাম।

তাদের দেয়া ফুলগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে হলের দিকে চলে এলাম।

এই হলো আমার ইউনিভার্সিটির শাড়ি পরার প্রথম এবং শেষ অভিজ্ঞতা। বাঙালি মেয়েদের পোশাকই হলো শাড়ি। অথচ এই শাড়ি পরে এভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে এটা চিন্তা করিনি। আসলে আমাদের দেশে কোনো অবিবাহিতা মেয়ে শাড়ি পড়লে সবাই একটু অন্য রকমভাবে দেখে। শাড়িটা শুধুই যেন বিবাহিতাদের পোশাক এটা সবাই মনে করে। এখন আমি বিবাহিতা, অহরহই শাড়ি পরছি। কিন্তু ওই রকম বিড়ম্বনার মধ্যে আর পড়তে হয় না।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

আলাদিনের আশ্চর্য

– প্রদীপ

মোহাম্মদ সোহেল রানা

যৌবনকালে প্রেমের উচ্ছল জোয়ারে ভেসে ভালোবাসার আলোয় আলোকিত হয় প্রতিটি মানুষ। কাজপাগল মামা আমার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের আশায় শঙ্কিত চিত্তে যৌবনের প্রতিটি সিড়ি পেরিয়ে এসে মধ্য বয়সে উপলব্ধি করছে *কতো ধানে কতো চাল।* যৌবনের প্রতিটি সময়ে কতো যে কুমারী অভিনব কৌশলে মামার হৃদয় কোণে মৌন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। প্রতিটি বয়সের একটি সুনির্দিষ্ট চাওয়া–পাওয়া থাকে। এই চাওয়া পাওয়ারও একটি লক্ষ্য অভিমুখ থাকে। কুমারীর দল মামার দুর্ভেদ্য হৃদয়ে ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত করতে না পেরে অবশেষে সময়ের আবর্তনে একে একে সবাই আপন লক্ষ্য অভিমুখে পাড়ি জমাতে শুরু করে। অথচ কোনো একজনকে আপন করে রাখার সামান্যতম প্রয়াস চালাননি ভীরু ও সঙ্কীর্ণ চিত্তসম্পন্ন মামা। দৈনন্দিন খাদ্যে পেট ভরে ঠিকই কিন্তু মন ভরে না। মন ভরাতে হলে চাই নিঃস্বার্থ নারী প্রেম, ভালোবাসা।

মামা এ কথাটি যখন উপলব্ধি করলেন তখন আয়নায় তার চেহারাতে পয়ত্রিশ বছর বয়সের ছাপ দেখলেন। অবশেষে হৃদয়ে অতি যত্নে লালিত ভালোবাসার অঙ্কুর মামার মনে কামনার আলো জ্বেলে দিল। প্রেম সঙ্গোপনে এসে মামার হৃদয়কে দোলা দিল। মামাও ভালোবাসার জন্য দেউলিয়া হয়ে আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া বান্ধবীদের পেছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু করলেন। কখনো মামার সাবেক বান্ধবীদের, কখনো সে সময়ের জুনিয়র মেয়েদের যারা একদা মামাকে প্রেম নিবেদন করেছিল তাদের ঠিকানা মানিব্যাগ থেকে বের করেন। এরপর শুরু করেন টেলিফোনের ওপর অত্যাচার। কিন্তু প্রতিটি টেলিফোনেই মামাকে হতাশ করলো। তাদের কেউই রাজি হলো না। যৌবনে মামার অহঙ্কারের কাছে তাদের প্রেম ব্যর্থতার বিষে ডুবে গিয়েছিল। সেই বিষে নীল হয়ে কেউ কেউ পাড়ি দিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, কেউ বা অন্য পুরুষের জ্যোৎস্নায় ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে শিপন শাড়ির গহীনে। কথায় বলে, *কপালে নাই ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি?*

ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়িতে ফেরার সময় মামা রোজ দরজায় তীর্থের কাকের মতো দাড়িয়ে থাকেন। প্রায়ই আমার সঙ্গে আসা বান্ধবীদের এক নজরে দেখাই মামার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আমিও ঘন ঘন বান্ধবীদের বাসায় নিয়ে আসি। কিন্তু আজ মামাকে দরজায় না দেখে সরাসরি মামার বেডরুমের গেলাম। রুমের দরজায় যেতেই মামার সুরেলা কণ্ঠে শুনতে পেলাম *শাড়ির নিচে কি সই... শাড়ির নিচে।*

আমার পদযুগলের শব্দে গান বন্ধ করে ডাক ছুড়লেন, কই ভাগ্নে এসো। দেখো তো দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বনেদী শাড়িতে তোমার মামিকে কেমন দেখায়।

মামা তোমার বিয়ে! হুররে বলে চিৎকার দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম।

ঘরের মধ্যে বনেদী শাড়ি হাতে নিয়ে মামা নাড়ছেন আর ভাবছেন।

বললাম, মামি কেমন?

এখনো ঠিক হয়নি। তোমার মা তোমার ঘরে পছন্দ করছে।

তাহলে দেখতে হয়, বলেই মামার রুম থেকে আমার রুমে গিয়ে দেখি মা ঘটকের সঙ্গে কথা বলছেন। বেশ কয়েকদিন ধরে ঘটকের আনাগোনা চললো। মামাও অধীর আগ্রহে বসে আছেন কবে মামিকে বনেদী শাড়িতে দেখবেন। কতো মেয়ের ছবিই না দেখালো। সব মেয়েকেই মামা পছন্দ করলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কন্যাপক্ষের। তাদের সবারই ওই এক কথা, টেকো মাথা চলবে না।

বয়সের তুলনায় মামার মাথায় চুল অনেক কম। মাথার সম্মুখ ভাগটা ছোট একটা স্টেডিয়াম ভাবা ভুল অথবা দোষের কিছু হবে না। ঘটকদের ব্যর্থতা আর মামার হতাশার দীর্ঘশ্বাস দেখে আমিই কনে খোজার কাজে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

অনেক তালাশের পর রক্ষণশীল পরিবারে এক মেয়ের সন্ধান পেলাম। মেয়েটির বয়স মামার তুলনায় অর্ধেকের এক বেশি। কালো দুটি চোখ। বাম চোখের মধ্য মণির পাশে ছোট একটি তিল, হাসলে গালের ত্বকটি ভাজ হয়ে ভালোবাসার প্রতীক আকারে গর্ত সৃষ্টি হয়। বাকা ঠোটের হাসি। যে ঠোট কিছুই চায় না, আবার কাউকে ফিরিয়েও দেয় না, সেই ঠোটে চুমু দিতে পারলে জীবন অর্থপূর্ণ ও সুখী হয়। ললনার রূপের বর্ণনা শুনেই বুক ভাঙা কান্নায় কেপে ওঠা মামার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠলো। দীর্ঘ দিনের জমাকৃত চোখের কালি ঘষামাজা শুরু করলেন। ইদানীং লক্ষ্য করছি, মামা বাথরুমে ঢুকলে অনেক দেরিতে বের হন। হয়তো সমগ্র কলেবরের যত্নের পাশাপাশি মামির জন্য রক্ষিত যন্ত্রের একটু বেশি যত্ন নেন।

সকল প্রকার জল্পনা–কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান এই কন্যা। তাই আপ্যায়নে কোনো কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেননি। যতোটুকু সম্ভব উজাড় করে দিয়েছেন। মামাও মহাসুখী। জামাই বলো কিংবা পুত্র, ওই একাই মামা। মামা মহাখুশি যেন আলাদিনের প্রদীপ হাতে পেলেন। সকল পর্বের সমাপ্তি, এখন শুরু হবে কবুল বলার পর্ব।

এমন সময় মামাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল পাড়ার দুটি ছেলে। বাইরে কি কথা হলো তা সে মুহূর্তে জানা সম্ভব হয়নি। তবে মামার কপালে চিন্তার রেখাটি বেশ ফুলে উঠেছিল। বাইরে থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ পরেই টয়লেটে যাবে বলে মামা রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ কেটে গেল বর আসছে না। অথচ কাজি সাহেব বর আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। অন্যদিকে বরের টয়লেটে যাবার কথা শুনে গ্রামসম্পর্কীয় মামার শালিকারা কানাকানি শুরু করলো, বিয়ে না হতেই টয়লেট, বাসর রাতে না জানি বিড়াল পালিয়ে যায় ইত্যাদি। প্রায় আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, মামার কোনো পাত্তা নেই।

অগত্যা আমি টয়লেটের কাছে গিয়ে মামা মামা বলে ডাকতে লাগলাম। কোনো উত্তর না আসাতে চোখ বন্ধ করে টয়লেটের দরজা খুলে পুনরায় মামা বলে ডাকলাম। এরপরও কোনো শব্দ পেলাম

না। তাই চোখ মেলে তাকালাম। কিন্তু একি! চোখে ডুমুরের ফুল দেখলাম। জোরে চিৎকার দিলাম, মামা নেই।

চারদিকে হই চই শুরু হলো, বর পালিয়েছে। কারণ হিসেবে জানা গেল একই পাড়ার বখাটে ছেলে সুমন প্রাণপ্রিয় (জীবনকে যে বেশি ভালোবাসে) মামাকে ভয় দেখিয়ে বিয়ের আসর থেকে বিতাড়িত করেছে। অগত্যা আমরাও বিয়ের আসর ত্যাগ করার জন্য উদ্যত হলাম। কিন্তু কন্যাপক্ষ বাধা দিল। তাদের এক কথা, বিয়ে না হয়ে বরপক্ষ উঠতে পারবে না। আমাদেরও একটাই অজুহাত, বর নেই, কি করে বিয়ে হবে? কনেপক্ষের জোরালো আবেদন, বর নেই তো কি হয়েছে। বরের দুলাভাই তো আছে। প্রয়োজনে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে। এভাবে চলতে থাকলো দুইপক্ষের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা।

ঝগড়া বিবাদের মাঝে কনে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার চোখের দিকে তাকাতেই হবু মামি তার চোখের মায়ায় আমাকে দুর্বল করে ফেললো। প্রথম দৃশ্যেই আমার মনে তাকে পাবার জন্য ভাবনার অবতারণা ঘটলো। ক্রমেই আমিও মামির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লাম। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দুইজনের মাঝে নীরব ভাষায় ভালোবাসার কথা বিনিময় হলো। তারপর ঝড়ের বেগে কনে আঙুল আমার দিকে তাক করে বললো, আমি তাকে বিয়ে করবো।

সম্ভবত কথাটি আমিই আগে বলতাম, কিন্তু প্রচণ্ড চাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল জড়তা ও ভয়। সামাজিক অনুশাসন ও সম্পর্কের অসমতার কথা ভেবেই নিজেকে সামলিয়ে রেখেছিলাম। এই আমি যে কি না সর্বদা অপরকে অবাক করতে পারদর্শী সেই আমি একটি নারী কর্তৃক আজ বিস্মিত হলাম। আম্মুর চোখের দিকে তাকালাম।

ঘরে সতীন তোলার চেয়ে ছেলের বৌ তোলা অনেক ভালো ভেবে আম্মু মাথা অবনত করে আমার বিয়ের অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে ব্যাগ থেকে একটি শিফন শাড়ি বের করলেন। বনেদী শাড়ির পরিবর্তে শিফন শাড়িতে সাজানো হলো মেয়েকে। এক ঝাক বাদকের বাজনায়, আনন্দ মুখর উৎসবের আমেজে রোমান্টিক অনুভূতি আর প্রাণঢালা আরেকবার আপ্যায়নের মাধ্যমে মামার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলাম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ।

এর সঙ্গে একটি যুবতীর জীবন-মরণ প্রশ্নের সমাধান হলো এবং অন্যদিকে এক প্রবীণের দুঃখ মেঘের ঘনঘটা শুরু হলো।

মুদিপাড়া, দিনাজপুর থেকে

যদি বুঝতাম

-মানিক

সকালে কলেজের পথে রওনা দিলাম। আমি এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই কাজলের সঙ্গে পরিচয় একই কলেজে। প্রথমে সব কিছুই নতুন ছিল। তবে সব কিছুই এক সময় ঔজ্জ্বল্য হারায়। সে রকম কিছুদিন পর থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু করি। ক্রমেই বন্ধু-বান্ধবী

বাড়তে লাগলো। বান্ধবীদের কথা বলতে গেলে লিখে কুলাতে পারবো না। প্রায় সকলেই স্মার্ট আর বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। যাহোক, কলেজে গিয়ে দেখি কাজল আজো আসেনি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার ও কাজলের প্রায় সব সাবজেক্ট একই। তাই এক সঙ্গে পড়া, নোট দেয়া–নেয়া আর বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার ফলে এক সময় আমরা বেশ ভালো বন্ধুতে পরিণত হলাম। যেহেতু একটু বড় হয়েছি, কলেজে যাওয়া আসা করছি তাই আমার চিন্তা ভাবনায়ও কিছুটা আধুনিকতার ছাপ পড়েছে। কাজল প্রায় দিনই কলেজে শাড়ি পরে আসতো। আমার আবার শাড়ি ঠিক পছন্দ হতো না। কেমন যেন গ্রাম্য লাগতো।

তাকে বলেছি, অনেকেই তো প্যান্ট পরে। তুমিও পরতে পারো। দেখতে ভালো লাগবে।

তার একটাই কথা, আমার এই শাড়ি পরা দেখেই তুমি আমার প্রেমে পড়েছো। তাছাড়াও আমরা বাংলাদেশি, আমরা যদি বিদেশিদের মতো প্যান্ট–শার্ট পরি তাহলে আমাদের নিজের বলতে থাকলো কি বলো?

এসব কথার উত্তর কিভাবে দেবো? শুধু আমি কেন? মনে হয় না কেউ দিতে পারবে। পথের ওপর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি, বুঝতে পারছি না বিষয়টা কি। কয়েকদিন আগে কাজলকে বলেছিলাম, তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাবো।

হঠাৎ আমার মনে হতে লাগলো যেন হাওয়ায় উড়ছি। আসলে আমার মন উড়ছে। কারণ দেখা যাচ্ছে তিনি আসছেন কিন্তু কেন যেন অস্বস্তি ভাব। কারণ আশ্চর্যের বিষয় হলেও কাজল আজ স্কিন টাইট প্যান্ট পরে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কাজল সোজা আমার কাছে চলে এলো এবং এসেই বললো, আজ তোমার বাসায় যাবো।

কিছুটা বিস্ময় নিয়ে বললাম, তোমার কি মাথা খারাপ? এই প্যান্ট পরা অবস্থায় যাবে?

সে বললো, কেন, খুব খারাপ লাগছে কি? কখন যাচ্ছো বলো?

আমার আর কি করার ছিল। বললাম, ইংরেজি ক্লাসটি করেই যাবো।

ক্লাস শেষে আমরা বাসায় গেলাম। আম্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সাহস হলো না। মা তো প্রথম দেখাতেই রাগে গজ গজ করতে থাকলেন। এটা অবশ্য প্রকাশ করলেন না। কিন্তু না করলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না। কিছুক্ষণ আম্মার সঙ্গে কথা বলে আমি ও কাজল বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। তাকে বললাম, কাজটা ঠিক হয়নি এই প্যান্ট পরা অবস্থায় তোমাকে নেয়া।

কাজল বললো, আমার তো মনে হয় ঠিক হয়েছে। কারণ প্যান্ট পরার জন্য তুমিই আমাকে কয়েকবার বলেছো।

তাই বলে আমাদের বাসায় যাবার দিনটাকেই তুমি বেছে নিলে?

কাজলের বাসায় আগমন বার্তা বাবার কানে গেল। তিনি আবার একটু হুজুর ধরনের। তিনি আমাদের দেশে যে যুগের হাওয়া লাগার কারণে মেয়েরা শার্ট প্যান্ট পরা ধরেছে এ বিষয়টিকে ঘোর অপছন্দ

করেন। তাই তিনি কাজলের সঙ্গে আমার মেলামেশা বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু বললেই হলো? আমি এখন বড় হয়েছি।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা দিলাম এবং ফল বের হলো। বুঝতেই পারিনি কিভাবে বছর চলে গেল। ফল একেবারে খারাপ না। বলা চলে ভালোই হয়েছে। বাবা বুদ্ধি করে আমাকে ভারতে ভর্তি করে দিলেন। বাধ্য হয়ে ভারতে গেলাম কমপিউটার সায়েন্স পড়তে। কাজল ঢাকায় চান্স পেল। কথা ছিল গিয়ে যোগাযোগ করবো। তবে ভারত গিয়ে বেশ কিছু চিঠি দিলাম, কোনো জবাব নেই। ফোনে চেষ্টা করলাম। পেলাম না। বুঝতে পারছি না হলোটা কি। তাকে না দেখে দুটো বছর গেল।

হঠাৎ বাসা থেকে চিঠি পেলাম। চিঠির প্রথমটা বরাবরের মতো। কিন্তু শেষে আমার চোখ আটকে গেল। বিষয় কাজল। কাজলের নামে এক গাদা দুর্নাম লিখে শেষে লিখেছে, কাজলের বিয়ে হয়েছে কয়েক মাস হলো এক ডাক্তারের সঙ্গে। আমার মনের যে অবস্থা যেন মরে যেতে পারলে বাচি। ভালোবাসা ওপরই ঘৃণা জন্মালো। পৃথিবীর কিছুই আর আমাকে স্পর্শ করে না। আমি এখন আমার ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বদ্ধপরিকর। দেশে ফেরার ইচ্ছাও শেষ। দেখতে দেখতে পাচটি বছর পেরিয়ে গেল। আমি পড়াশোনার সঙ্গে অন্য কিছুও করছি। বাসায় চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েছি। টাকা পাঠাতে নিষেধ করেছি। সুযোগ পেলে অন্য কোনো দেশে চলে যাবো।

হঠাৎ বাসা থেকে চিঠি এলো, *মাকে দেখার ইচ্ছা থাকলে চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো।*

পড়িমরি করে দেশে ফিরলাম। বাসায় গিয়ে দেখি মা দিব্বি ঘরের কাজ করছেন। প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে তোমার? আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। উল্টো আমাকে পেয়ে সারা বাড়ি নেচে উঠলো।

বাসায় এসেছি দুই দিন হলো। এখনো বাইরে যাইনি। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। মা কতো চেষ্টা করলেন যাতে আমি একটু বাইরে ঘোরাফেরা করে আগের মতো প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠি। এক সময় টের পেলাম বাড়িতে একটি কানাকানি চলছে এবং চাপা হাসি। মনে হলো আমাকে নিয়েই বুঝি। এক সময় বুঝতে পেলাম কারো যেন বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ে কার মা?

জবাব যা দিলেন তাতে আকাশ থেকে পড়লাম। বিয়েটা আমারই। বুঝতে পারলাম আমাকে ফাদে ফেলা হয়েছে।

বললাম, আমার একদম ইচ্ছা নেই।

মা বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি বিয়ে করো এবং দেশেই থাকো।

সকলের পীড়াপিড়িতে বাধ্য হয়ে মনে করলাম সকলে যদি খুশি থাকে তো ভালোই। রাজি হলাম। পরদিন বিয়ে। সব কাজ সম্পন্ন হলো।

কনের নামও জানি না আর দেখার প্রশ্নই আসে না। মা একবার প্রশ্ন করেছিলেন, কি রে, মেয়ে দেখতে কেমন কিছু তো জানতে চাইলি না।

তোমরা দেখলেই হবে।

বিয়ে হয়ে গেল।

কেন জানি না আজ কাজলের কথা বড় মনে পড়ছে। মনটা বিষণ্ন। রাতে একটু দেরি করেই বাসরঘরে গেলাম। তাও যেতাম কি না সন্দেহ। সকলে জোর করে ঢুকিয়ে দিলো তাই। বাসরঘরে গিয়ে এক নজর কনের দিকে মানে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি ঘোমটা মাথায় একজন বসে আছে। সে যে আমার স্ত্রী সেই অনুভূতিটা তখনো আসেনি। স্ত্রীর মুখ দেখার আগ্রহ বোধ না করে বিছানার এক পাশে আস্তে শুয়ে পড়লাম। স্ত্রীর হাতে চুড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম আমার পিঠের পাশে এসে সে বসেছে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, কেমন লাগছে লনি?

আমি কণ্ঠস্বর শুনে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। কারণ এ কণ্ঠস্বর আমার অনেক শোনা, অনেক জানা। তাড়াতাড়ি টেবিল লাইট অন করি। দেখি কাজল মুখ টিপে হাসছে। আমি হা করে তাকিয়ে থাকলাম। কাজল আমার একেবারে আমার পাশে এসে বসলো। কাপা কাপা হাতে কাজলের হাতটা ধরলাম।

পরে জানতে পারি, ভারতে আমি থাকতে এক সময় অনেক কথা শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। পরে যখন বাবা ও মা অনুভব করতে থাকেন ছেলে হারাতে বসেছেন তখন তারা ঠিক করেন ছেলের বিয়ে দিয়ে আটকে রাখো। মেয়ের খোজ গিয়ে করতে তারা কিভাবে যেন জানতে পারে কাজল মেয়েটা এমনি ভালোই, সব সময় শাড়ি পরে এবং একটু প্যান্ট পরা ধরেছিল তাও নাকি আমার ইচ্ছায়। মেয়েদের শাড়ি পরা বাবা ও মা খুব ভালো চোখে দেখে। তাই অল্পতে তারা কাজলকে পছন্দ করেন। আর চিঠির ব্যাপারটা মাথায় আসে কাজলের। সে মনে করেছে, আমাদের বিয়ের কথা আমি জানতে পারলে পড়াশোনা শিকেয় উঠবে। তাই এই কারসাজি। এখন আমি প্যান্টকে ভয় করি আর শাড়ি পরাকে শুভ লক্ষণ মনে করি। যদি আগে বুঝতাম তাহলে কাজলকে সেদিন শাড়ি পরিয়ে বাসায় নিয়ে আসতাম।

খুলনা কলেজ, খুলনা থেকে

রাজনৈতিক–অরাজনৈতিক

– নাসিম

রাজনৈতিক

কোরবানি ঈদের আগে একদিন রিয়াজউদ্দিন বাজারে গিয়েছি টুকটাক কেনাকাটার জন্য। সঙ্গে বন্ধু আসিফ। আসিফের এক আত্মীয়ের দোকান আছে সেখানে। শাড়ির দোকান। সেখানে গেলাম।

দোকানের এক কর্মচারী একজন মহিলাকে শাড়ি দেখাচ্ছে, *নিয়া যান আপা, হাসিনা শাড়ি, বাজারে নতুন আইছে।*

হাসিনা শাড়ির দিকে তাকালাম। নৌকার ছাপ মারা শাড়ি। নির্বাচনের দিন হাসিনা এই রকম নৌকা প্রতীক যুক্ত শাড়ি পরেছিলেন। মহিলা আওয়ামী সমর্থকরা সেটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই হয়তো এই শাড়িগুলো কিনবেন।

ভাবলাম, শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে *হাসিনা ফ্যাশন হাউস* নামে একটা দোকান খুলে দেখতে পারেন। সেখানে এই শাড়িগুলো রাখা যাবে।

দোকানের এক কর্মচারীকে বললাম, ভাই, খালেদা শাড়ি নেই?

সে জবাব দিল। সেটাও আছে। শিফন শাড়িকে খালেদা শাড়ি হিসেবে চালিয়ে দিই।

আর জামায়াতি শাড়ি?

জামায়াতিদের জন্য অন্য পোশাক। শাড়ি নয়, বোরখা।

এরশাদের সমর্থকদের জন্য কোনো শাড়ি আছে?

না।

কেন? এটা তো এরশাদের সাপোর্টারদের প্রতি অবিচার হলো।

তরুণ কর্মচারী সরস উত্তর দিল, নেই। কারণ এরশাদের সমর্থকরা হয়তো তাদের নেতার মতোই নারীদের শাড়িবিহীন অবস্থায় দেখতেই বেশি পছন্দ করে!

অরাজনৈতিক

২০০০ সালের ঘটনা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেকার বসে আছি। একদিন পাড়ার এক ভদ্রলোক ডেকে বললেন, বাবা, আমার মেয়েটাকে একটু পড়াতে হবে।

আমি সরাসরি না করে দিলাম। মেয়েদের প্রাইভেট পড়ানোর ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে।

কিন্তু ভদ্রলোকের প্রচণ্ড জোরাজুরিতে অবশেষে রাজি হলাম। অবশ্য সে জন্য আরেকটা কারণও আছে। মাসিক বেতন ২০০০ টাকা। কম তো নয়!

ভদ্রলোকের মেয়ের নাম মেরী। পড়ানোর সাত দিনের মাথায় স্পষ্ট টের পেয়ে গেলাম যে, মেরী আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

কিন্তু এই মেয়েকে আমার একদম পছন্দ ছিল না। বরং খুব বিরক্ত লাগতো। কিন্তু মেরীকে সেটা বুঝতে দিতাম না।

একদিন সে শাড়ি পরে পড়তে এলো। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে কেমন লাগছে?

তাকে মোটেও ভালো দেখাচ্ছিল না। লাল শাড়ি পরেছিল। খুব বিদঘুটে লাগছিল। তবুও আমি হাসি হাসি মুখ করে বললাম, শাড়ি পরলে সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে।

সে সম্ভবত আমার কথায় মুগ্ধ হয়েছিল। এরই প্রমাণ পাওয়া গেল পরে। সে প্রতিদিন নতুন নতুন শাড়ি পরে আসতে লাগলো। আমি ভেবে পেতাম না এতো শাড়ি সে কোথায় পায়। তাকে কোনোদিন একটি শাড়ি দ্বিতীয়বার পরতে দেখিনি।

একদিন বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম যে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে সে শাড়ি ধার নিচ্ছে।

শাড়ি রহস্যের সমাধান তাহলে পাওয়া গেল। কিন্তু এভাবে কতো দিন? একদিন ধার করে শাড়ির স্টকও শেষ হয়ে যাবে।

তখন?

আমি অপেক্ষায় থাকলাম।

সে বোধহয় আমাকে অবাক করতে চাইছিল। হয়তো চাইছিল আমি যেন তাকে শাড়ি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

কেন, কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু না। শাড়ি প্রদর্শনী চলছেই। শেষে একদিন অতি বিরক্ত হয়ে বললাম, মেরী, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।

সে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

বললাম, তোমাকে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। শাড়ি পরলে তোমাকে মোটেই ভালো লাগে না। খালাম্মা খালাম্মা লাগে। মনে হয় তিন বাচ্চার জননী।

তার মুখ কালো হয়ে গেল। এরপর আর তাকে শাড়ি পরতে দেখিনি আমার সামনে।

কয়েকদিন পর তারা বাবা এসে বললেন যে, বাবা, আমি খুব দুঃখিত। মেরী তোমার কাছে আর পড়তে চাইছে না।

চট্টগ্রাম থেকে

অমানুষ

–স্বপ্ন

একবার এক জরুরি কাজে রাজশাহীতে গিয়ে আমার বন্ধু সুমনের বাসায় উঠলাম। বিশাল বাড়ির চারধার গাছ–গাছালিতে ভরা। আমার বন্ধু বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম মৌ। খুবই সুন্দরী। যে কোনো পুরুষকে আকর্ষণ করার মতো ক্ষমতা তার আছে। এই রকম মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সুমন নিশ্চয়ই ভাগ্যবান এ কথা মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু এখানে এসেছি তিন দিন হয়ে গেল অথচ সুমন ও তার স্ত্রীর মধ্যে তেমন একটা সুসম্পর্ক লক্ষ্য করলাম না। সুমনকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, কি রে, প্রেম করে না বিয়ে করেছিস?

সুমন এক গাল হেসে বললো, প্রেম? দুশ্চরিত্রার সঙ্গে প্রেম!

দুশ্চরিত্রা কাকে বলছিস? প্রশ্ন করলাম।

মৌ।

কেন? জানতে চাইলাম।

তবে শোন। বিয়ের আগে মৌ এক ছেলের সঙ্গে পাচ বছর প্রেম করে আমাকে বিয়ে করেছে শুধু আমার টাকা–পয়সা, জায়গা–জমির লোভে পড়ে, বললো সুমন।

তা যখন বিয়ে করেই ফেলেছিস পুরনো কথা মনে করে সংসারে ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ? এভাবেই সুখী হওয়ার চেষ্টা কর। বললাম আমি।

এরপর ও চলে গেল ব্যবসায়ের কাজে। বিছানায় গা এলিয়ে মৌ ও সুমনের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ মৌ আমার রুমে ঢুকে বললো, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না তো, বলে উঠে বসলাম।

আপনার বন্ধু আমার সম্পর্কে আপনাকে অনেক কথাই তো বলেছে। আমি বাইরে থেকে সব শুনেছি। ভাবছেন আমি লোভী, দুশ্চরিত্রা।

কিছু বললাম না। চুপ করে রইলাম।

জেনেছেন বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে আমার ভালোবাসা ছিল। তাকেই বিয়ে করতাম। আমি ছিলাম আমার বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান। শুধু বাবার অনুরোধ রাখতেই আপনার বন্ধুকে বিয়ে করতে হলো আমার।

আর এটা কি আমার অন্যায় হয়েছে? এই জন্য আমাকে কতো নির্যাতন সহ্য করতে হয় তা আপনি জানেন না। দেখুন বলে মৌ তার বুকের ওপর থেকে শাড়ি সরিয়ে ফেললো।

দেখলাম, স্তন দুটো অনেক পোড়া ক্ষতে ফুলে আছে। এসব কিসের দাগ? জানতে চাইলাম।

আপনার বন্ধু সিগারেটের ছ্যাকা দিয়েছে। ঘা–এর জন্য আমি এখন ব্লাউজ পরতে পারি না। কি যে এক যন্ত্রণা। আরো দেখুন। সে এবার পুরো শাড়ি খুলে ফেললো।

একদম নগ্ন।

তার যৌনাঙ্গের ওপর বহু সিগারেটের ছ্যাকার গোল গোল দাগ।

সুমনের প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল মন। ভাবতে লাগলাম কেমন করে একজন মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে। তবে তার মুখে কোনো ক্ষত না দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মুখে তো কোনো দাগ দেখছি না।

মৌ বললো, এটা তার ভদ্রতার মুখোশ। আপনি দয়া করে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন।

সেদিন সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। কি করবো না করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভাবতে লাগলাম, একখানা শাড়ির আবরণে কতো দুঃখ, যন্ত্রণা ডেকে রাখে মৌ!

সকালে কাউকে কিছু না বলে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

হঠাৎ

এ দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীবনে আমার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি ধ্রুব সত্য লক্ষ্য করি যে, প্রতিটি উৎসবের দিনই আমার কাটে নিরানন্দভাবে। তাই সব সময় উৎসব মুখর পরিবেশকে ভয় পাই। কারণ হিসেবে পাঠকদের বলতে চাই, এ রকমের প্রতিটি উৎসবে দেখতে পাই যে, আমার ভালোবাসার সঙ্গিনী অন্য কারো সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাও আবার আমারই চোখে পড়া লাগে।

১৪০৯ সালের পহেলা বৈশাখ। এবারও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। আমার প্রিয়জনের সঙ্গে তেমন কোনো ভাব তখন পর্যন্ত জমেনি। বন্ধুদের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একখানা শাড়ি কিনেছিলাম এবারের পহেলা বৈশাখে তাকে দেবো বলে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পরিপাটি হয়ে শাড়িখানা নিয়ে ভালোবাসার মানুষটির বাড়ির দিকে যেতেই দেখি সে অন্য একজনের সঙ্গে রিকশায় হুড তুলে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। এই অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখার পর মনে হলো, ঈশ্বর, তুমি মাটি ফাক করো আমি তোমার

মধ্যে অন্তর্ধান করি। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। দাড়িয়েই রইলাম তাদের যাওয়ার পথে। খুব বেশি পরিমাণে ব্যথিত হইনি। কারণ এ ধরনের দুঃখগুলো প্রায়ই পাই। তারপরেও আমি ক্লান্ত নই।

যুদ্ধাহত সৈনিকের মতো বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই মনে হলো, খালাতো ভাইয়ের বাসায় যাই। এই বাসায় আমার অবাধ বিচরণ, দিন–রাতের যে কোনো সময়। তাই কারো কোনো উদ্বেগ নেই। আরো ভালো লাগে আমার এক প্রাণপ্রিয় ভাবী থাকে বলে। ভাবী যে কতো সুন্দর তা তাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার বৌদিকে নিয়ে যেসব কবিতা, গান লিখেছেন তা থেকে কোনো অংশে আমিও কম রচনা করিনি। কিন্তু ভাষা প্রকাশ ভঙ্গী হেতু তা প্রকাশ করতে পারিনি। সত্যি বলতে কি মনে মনে তাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। তবে কিন্তু আমার প্রতি ভাবী তেমন সদয় নন। তারপরেও ভাবীকে দেখার জন্য প্রায় প্রতিদিনই যাই। পহেলা বৈশাখের এই দিনে মন যখন খারাপ হলো তখন শাড়িখানা নিয়েই খালার বাসায় যাই। খালা বাসায় ছিলেন না। হাতে শাড়ির প্যাকেটখানা দেখে ভাবী বললেন, কি হে শাড়ি আবার কার জন্য?

বললাম, ভাবী, আপনার জন্য আমার এই সামান্য উপহার।

বিশ্বাস না করারই কথা। অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো হলো যে, শাড়িটি আপনার। তখন বাজে সকাল এগারোটা, বললাম, চলুন। ভাবী বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসি।

ভাবী এই প্রথম এক বাক্য রাজি হয়ে গেলেন। ভাবী শাড়ি পরতে যাওয়ার ফাকে আমি পত্রিকায় রাশিফল দেখে নিলাম আজ কেমন যাবে না, ঠিকই আজ প্রেম ভাগ্য ভালো।

হলুদ শাড়ি, হলুদ টিপ। অপূর্ব। অনেক প্রিয় রঙগুলোর মধ্যে হলুদ হলো আমার প্রিয় একটি রঙ। রিকশায় যখন উঠলাম তখন নিজেকে খুব অহঙ্কারী মনে হচ্ছিল। আসলে সুন্দরী কেউ থাকলে পথ চলতেও আনন্দ। রিকশা দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে তাতেই আমার গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে।

রিকশা নিয়ে প্রথমে কারমাইকেল কলেজে গেলাম বৈশাখের প্রথম দিন কলেজে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছি তা দেখার পর সেখান থেকে গেলাম তাজহাটের রাজবাড়ি।

রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে নামতেই নিজেকে অনেকটা রাজা ভাবতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ঘোরার পর ভাবীকে বললাম, চলুন উপরে ছাদে যাই। অন্যদিনের আজ এখানে বেশ ভিড়।

গেটে দারোয়ানকে কিছু টাকা দিলেন তিনি দরজা খুলে দিলেন ছাদে যাওয়ার জন্য। নিচে ভিড় একটু বেশি হলেও উপরে তেমন একটা ভিড় নেই। ছাদে কিছু দূরে একটি বদ্ধ ঘরের দিকে উকি দিতেই দেখলাম এক কাপল খুবই অন্তরঙ্গভাবে একে অপরকে জড়িয়ে আছে। ভাবীকে তা দেখতেই তিনি বেশ লজ্জা পেলেন। পরক্ষণের আবার বললেন এই বয়সে করবে না তো কোন বয়সে করবে।

বললাম, দেখুন এতোগুলো বসন্ত পেরিয়ে গেল এখন পর্যন্ত কারো স্পর্শ পেলাম না। ভাবতেই কেমন যেন ফাকা লাগে।

ভাবী বললেন, চেষ্টা চালিয়ে যাও, একদিন সফল হবেই।

রাজবাড়িটি বেশ বড়। তাকে নিয়ে এঘর, ওঘর দেখাতে দেখাতে এক নির্জন রুমে আমরা পৌছালাম।

ভাবীকে বললাম, ভাবী, জানেন চুরি করে চুমু খাওয়ার মজাই আলাদা। এটি অবশ্য আমার কথা নয়, এটি একটি উদ্ধৃতি।

তিনি বললেন, হ্যা তা তো জানি, চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা।

সাহস করে বলেই ফেললাম, আসুন না একটু চুরি বিদ্যার সদ্ব্যবহার করি।

এই দুষ্টু, কি বললে!

শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনে প্রথম কোনো নারীর ঠোটে সেই প্রথম আমার ঠোট স্থাপন করলাম।

প্রথম অবস্থায় বাধা দিলেও পরে অবশ্য তিনিও অংশ নিলেন। কারো পদযুগলের সাড়ায় আমরা বাহুমুক্ত হলাম।

তাকে বললাম, যদি এই বছরের প্রতিটি দিন এই রকম যেতো...।

এই দুষ্টু!

সত্যি, এক নতুন ভালোলাগায় উদ্ভাসিত হলাম আর সিক্ত করলাম নিজেকে। মনে মনে ভাবলাম, কার প্রাপ্য আর কার প্রাপ্তি? ধন্যবাদ শাড়ি, ধন্যবাদ শাড়ি।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
মুনসিপাড়া, রংপুর থেকে

পরিচয়

–অপু রায়হান

সেদিন ছিল শুক্রবার। ছাব্বিশ মার্চ ১৯৯৯। আমি ও আমার বন্ধু আকাশ তার বড়ভাইয়ার বিয়ের কার্ড বিলি করার জন্য হাটহাজারী ফতেয়াবাদ স্কুল গেট থেকে কিছু দূর এগিয়ে মাদ্রাসা যাবার উদ্দেশে একটি টেম্পোতে ওঠার চেষ্টা করছি। কিন্তু হায়! আমাদের কি সৌভাগ্য টেম্পোর মধ্যে অপরূপ রূপের একটি মেয়ে বসে আছে।

তার অঙ্গে ছিল নীল রঙ–এর শাড়ি। মেয়েটিকে সেই শাড়িতে এমনভাবে সুন্দর লাগছিল যেন তাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো এক ডানাকাটা পরী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী করে তৈরি করেছে বিধাতা তাকে। আমাদেরকে এক পলক দেখার সুযোগ দেয়ার জন্য বিধাতা হয়তো তাকে সেখানে বসিয়ে রেখেছিল। আমরাও আর দেরি না করে তাকে কাছ থেকে এক পলক দেখার উদ্দেশে তার পাশের একটা সিটে বসে গেলাম।

গাড়িটি ফতেয়াবাদ বটতলী অতিক্রম করার সময় হঠাৎ কবরস্থানের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েই উল্টে যায়। আমরা সবাই গাড়ির মধ্যে এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাই। এমন সময় ঘটলো হৃদয়বিদারক দৃশ্য। সামনের সিটে বসা একজন বৃদ্ধলোক হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

অপরূপ রূপের মেয়েটির মাথার এক পাশে কেটে গেল। আমরা দুই বন্ধু মেয়েটির অনুরোধে তাকে স্থানীয় একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সেলাই করিয়ে সোজা তাদের বাসায় চলে গেলাম।

মেয়েটির মায়ের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পরের সপ্তাহেই তাকে আবার দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি সে পুরোপুরি সুস্থ। অনেক কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তার বিস্তারিত পরিচয়। তারা দুই বোন মিতা এবং রিটা। তাদের আব্বু দুবাই একটা সরকারি ফার্মে চাকরি করেন। মা সুদর্শনা গৃহিনী। মিতা অপরূপ রূপের চট্টগ্রাম শহরের কোনো এক প্রান্তে একটা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী।

এভাবেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়, পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে দুই বছরের একটানা প্রেম। বছরের প্রতিটি ঈদে তার শুভজন্মদিনে, নববর্ষের প্রথম দিনে, তাকে একটি করে লাল বেনারসি শাড়ি উপহার দিতাম।

কারণ তার প্রিয় পোশাক ছিল শাড়ি। তাছাড়া আমার সেই মনের মানুষটিকে লাল বেনারসিতে এতো বেশি সুন্দর লাগে যেন তাকে দেখে মনে হয় স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা।

আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসাকে সে প্রত্যাখ্যান করে সদ্য দুবাই ফেরত এক ছেলেকে বিয়ে করলো। তার নাকি খুব শখ নামি-দামি গাড়িতে চড়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করার, দেশের দামি হোটেলে চায়নিজ খাবার, অত্যাধুনিক শপিং সেন্টারে গিয়ে দামি শাড়ি, অলঙ্কার সেট কেনার। কিন্তু আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ সহজ-সরল ছেলে।

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম থেকে

পরিত্যক্ত

-এম.ইউ সুমন

রিপা বললো, এই তুমি আমার বর হবে?

শুনে আমি একদম থতমত খেয়ে যাই। দুপুরের পর রিপাদের বাসায় এসে দেখি কেউ নেই। রিপার মা বাবা অর্থাৎ খালা-খালু কোথায় বেড়াতে গেছেন। বাসায় কাজের মেয়ে পাশের রান্না ঘরে ঘুমাচ্ছে। আমি খাটের এক কোণে বসলাম। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। এখন বেরিয়ে গেলে ভিজতে হবে।

রিপাকে বললাম, খালা কোথায়?

বললো, আব্বুর সঙ্গে বাইরে গেছে। ফিরতে রাত হবে।

তুমি কি করছো?

খেলছি।

খেলো, আমি যাই।

কেন?

কি করবো, বাসায় তো কেউ নেই।

আমি আছি না!

তুমি তো খেলছো।

তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো, গল্প করবো।

রিপাকে বললাম, তুমি খেলো আমি ঘুমাই।

রিপা বললো, না, তুমিও আটমার সঙ্গে খেলো। এসো বর বৌ খেলি।

রিপার কথায় খুব মজা পেয়ে যাই। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। রিপা পরে আছে ছেলেদের মতো হাফ হাতা শার্ট। বুকের সামনে দুটো বোতাম খোলা। নড়াচড়ার সময় রিপার গোলাপ পাপড়ির মতো বুক দেখা যায়।

রিপা বললো, বলছো না কেন?

কি বললো?

তুমি আমার বর হবে না?

হবো।

তা হলে ওঠো।

উঠে কি করবো।

বাথরুমে গিয়ে গোসল করে এসো। আমি খাবার রেডি করছি। খাওয়ার আগে গোসল করতে হয়। তুমি আমার বর। আমি এখন থেকে যা বলবো তা সব তোমাকে শুনতে হবে। এখন থেকে তুমি আমাকে আর রিপা বলে ডাকবে না।

কি বলে ডাকবো?

বৌ!

আমি হেসে বলি, আচ্ছা।

গোসলের পর খালি গায়ে লুঙ্গি পরা অবস্থায় সত্যিই যেন বরের মতো লাগছে। রিপা ভারী খুশি গলায় বললো, তোমাকে নুতন বরের মতো লাগছে।

কিন্তু তোমাকে বৌ–র মতো লাগছে না।

আমি কিছু বলার আগেই রিপা মিষ্টি হেসে বললো, ও বুঝেছি, দাড়াও আসছি।

রিপা ছুটে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ চমকে মুখ ঘোরাই, তারপর রিপাকে দেখে অবাক হয়ে যাই। রিপা পেচিয়ে পেচিয়ে পরেছে কড়া লাল এক সুতি শাড়ি। মুখে পাউডার, কপালে লাল টিপ, ঠোটে লাল লিপস্টিক, গলায় সুন্দর মালা। আবার ঘোমটা দিয়েছে রিপা। মুগ্ধ হয়ে রিপার দিকে তাকিয়ে থাকি। লাল শাড়িতে রিপাকে এতো সুন্দর লাগছে যেন রূপকথার পরী।

বললাম, রিপা, তোমাকে সত্যিকারের বৌ–র মতো লাগছে।

আমি তো এখন বৌই।

আমি বোকার মতো বলি, কার?

ওমা, নিজের বৌকে বলছো কার বৌ!

লিপস্টিক মাখা লাল ঠোঁট ছড়িয়ে খুব মিষ্টি করে হাসে রিপা। দেখে বলি, রিপা, তুমি আর কখনো লিপস্টিক মেখো না। তোমার ঠোঁট এমনিতে খুব লাল।

রিপা অভিমানে সুন্দর হয়ে গাল ফুলিয়ে বললো, একশবার মাখবো, তোমার কি? তুমি আমাকে রিপা বলে ডাকলে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ভুলটা বুঝতে পারি। তখন বললাম আর কখনো রিপা বলে ডাকবো না। সরি।

রিপা নরম ভঙ্গিতে হেটে এসে আমার হাত ধরে। যাহ! বৌ–র কাছে কেউ বুঝি সরি বলে।

রিপার শরীর থেকে ভারী মিষ্টি, নুতন বৌদের গা থেকে যেমন গন্ধ আসে তেমন একটা গন্ধ আসছিল। সেই গন্ধে কি যে হয় আমার। আমি দুই হাতে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরি রিপাকে। তারপর ঘাড়ে, গলায় মুখ ঘষতে থাকি, চুমু খেতে থাকি।

রিপা ছটফট করে বললো, এখন এমন করো না লক্ষ্মীটি। এসো, আগে খেয়ে নাও।

এদিনের আগে রিপাকে আমার কখনো খেয়াল করে দেখা হয়নি। রিপা এতো সন্দুর, এতো ঘরোয়া, আমার জানা ছিল না আজ থেকে রিপা আমার কাছে অন্য মানুষ হয়ে যাবে!

খাওয়া শেষে রিপা বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমাও।

তুমি ঘুমাবে না? দাড়াও দরজাটা বন্ধ করি।

রিপা তারপর দুহাতে দরজা বন্ধ করে। আলো নিভিয়ে দিল। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। এই ঘরে গভীর অন্ধকার এখন। কেউ কারো মুখ দেখতে পাই না।

অন্ধকারে রিপা ফিশফিশ করে বললো, ওগো, আমাকে কোলে নাও।

দুহাতে পাজা কোলে নিই রিপাকে। তারপর মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে যাই। যেন গভীর ভালোবেসে রিপাকে বিয়ে করেছি। রিপা আমার সত্যিকারের বৌ, আমি রিপার বর। আজ আমাদের বিয়ের প্রথম রাত যাপন করতে যাচ্ছি। রিপাকে কোলে নিয়ে চমৎকার এক স্বপ্নের ভেতর চলে গেলাম। রিপার গায়ে কিশোরীর হৃদয় আকুল করা গন্ধের সঙ্গে মিশেছে সেন্ট আর পাউডারের গন্ধ। রিপার শরীর এতো নরম, আমার কোলে যেন রিপার অস্তিত্ব ছিল না, ছিল বিশাল এক গোলাপ। আমরা দুজনেই স্বর্গ নদীর স্রোতে ডুবে যাই। দুজনের আবরণ খসে পড়ে।

ফিশ ফিশ করে বললাম, খালা ফিরে আসার সময় হলো।

এবার ছটফট করে উঠলো রিপা। তাইতো, একদম মনে ছিল না। অন্ধকারে রিপা কেমন করে কখন যে পরে নিয়েছে হালকা গোলাপি স্কার্ট। রিপা বললো, এই, আমি লাইট জ্বালাচ্ছি।

জ্বালো।

কেন যে আমার তখন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আনমনে বিছানার দিকে তাকাই। এলোমেলো বিছানায় অবহেলায় পড়ে আছে রিপার সুন্দর করে পরা সেই সুন্দর লাল শাড়িটি।

খুশীপুর, দাগনভূইয়া, ফেনী থেকে

নিষেধ

–সুইট

ময়মনসিংহের একটা কলেজে সে অনার্স পড়ছিল আর আমি ঢাকা ইউনিভার্নিটিতে। কালেভদ্রে দেখা হতো। কথা হতো না কোনো চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া। কথাবার্তা যা হবার হতো চিঠিতে অথবা টেলিফোনে। একদিন তার সঙ্গে দেখা হবার কথা। যথাসময়ে চলে গিয়েছি নির্ধারিত বাসায়। আজ তাদের কলেজ থেকে পিকনিকে যাবার কথা। শাড়িই তার প্রিয় পোশাক শুনেছি অনেক। কিন্তু শাড়িতে তাকে দেখা হয়নি কখনো। দেখবো বলেই আজ আসা।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সে পরে এলো শাড়িটা। অদ্ভুত, অপূর্ব ফ্যানটাস্টিক। মাধুরী তো তার কাছে নস্যি। অপলক তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। এ দেখার কোনো শেষ নেই।

শুধু বললাম, সুন্দর। খটকা লাগলো মনের ভেতর, তাকে কখনো শাড়ি পরতে দেয়া যাবে না। তৎক্ষণাৎ কথাটা তাকে বলিনি। ফিরে এসে লিখলাম চিঠিতে।

আপাতত আর শাড়ি পরবে না। শাড়িতে তোমাকে যে অপূর্ব লাগে সেটা দেখলে যে কেউ তোমাকে পছন্দ করে ফেলবে। তোমাকে আমি হয়তো আর পাবো না।

এরপর থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত সে আর শাড়ি পরেনি। সাজসজ্জা এমনকি কোনোদিন লিপস্টিকও মাখেনি। অবাক হয়েছি আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসায়।

এখন সে আমার বৌ। একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষক। আর আমি ঢাকায় ছোট একটা প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত।

বিয়ের পর থেকেই ইচ্ছা তার জন্য একটা ভালো শাড়ি কেনার। কিন্তু সামান্য বেতনে ত্রাহি অবস্থা। এ মাস সে মাস করেই দিন, মাস, বছর যাচ্ছে, অথচ তার প্রিয় পোশাকটা তাকে গিফট দিতে পারছি না।

ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা থেকে

অপারগ

–আবদুর রাজ্জাক মিয়া

আগের দিনে গ্রামের ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করা হতো। আজকের দিনের মতো এতো ছোট বয়সে নয়। আমিও ব্যতিক্রম নই। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমার সহপাঠী একটি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা বা প্রেম নামে আমার সম্পর্ক হয়। আমার সেই প্রেয়সীর নাম ছিল বিনীতা। এবং তার মা ছিল আমদের শিক্ষিকা। ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তা কিছুই বুঝতাম না। শুধু এতোটুকু বুঝতাম, একজন আরেকজনের কাছাকাছি থাকা, হাত ধরে হাটা, চুল

ধরে আদর করা, আড় চোখে তাকানো। এমনি করে চলছিল আমাদের ভালোবাসা বা মন দেয়া–নেয়ার পর্ব।

প্রাথমিক স্কুলের পাট শেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ি। শুরু হলো অপেক্ষার পালা। প্রতিদিন তার জন্য আমি অথবা আমার জন্য সে অপেক্ষা করতো। এমনিভাবে একত্রে দুজন স্কুলে যাওয়া–আসা করতাম। আসা–যাওয়ার পথে নানান রকম গল্প, আলাপ–আলোচনা, ইয়ার্কি, দুষ্টুমি, হাত ধরে হাটা, চোখে চোখ রাখা এসব অনুভূতির কথা ভাষায় লিখে বোঝাতে পারবো না। আর অবসরে চুপি চুপি চলে যেতাম অজানা গন্তব্যে। মাধ্যমিক স্কুলের সাইক্লোন সেন্টারের তিন তলায় পাশাপাশি বসে বাদাম, মুড়ি, চানাচুর অথবা অন্য কিছু খেতাম এবং চোখে চোখ রাখতাম, হাতে হাত, একজন আরেক জনেরটা কেড়ে নিতাম বা খাইয়ে দিতাম। যা কিছু চলছিল সবই সকলের অগোচরে।

ক্লাস এইটে পড়ার সময় বিনীতা একদিন আমাকে দুর্গা পূজার নিমন্ত্রণ করলো। আমিও লোভ সামলাতে না পেরে চলে গেলাম। তাকে দেখে আমার দুই চোখ যেন অপলক তাকিয়ে আছে। নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না সে মানুষ নাকি অপ্সরী। হয়তো সেদিন যদি কাজী নজরুল অথবা রবীন্দ্রনাথ তাকে ওই সাজে দেখতো তাহলে কতো না জানি কবিতা লিখে ফেলতেন। কিন্তু আমার মতো বোকার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে শুধুই চেয়ে দেখছি। কারণ সেদিন তার পরনে ছিল লাল শাড়ি, কপালে ছিল লাল টিপ।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলাম। জানি না সেদিন কতোক্ষণ এভাবে তাকিয়ে ছিলাম। তার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমাকে সে ইশারায় সে ডাকলো। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ঘরের পেছনে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর সেও এলো। কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জড়িয়ে ধরে তার গোলাপের পাপড়ির মতো অধরে একে দিলাম ভালোবাসার প্রথম চুমু। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে একে দিল তার ভালোবাসার নিদর্শন চুমু। জড়াজড়ি করে বসে পড়লাম। কতো আদর, কতো সোহাগ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এভাবে অনেকক্ষণ পর একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বাড়ি এসে সারা রাত ঘুমহীন কাটলো। দুচোখের পাতায় শুধুই তার ছবি ভেসে উঠলো। সকালে যথারীতি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে তার জন্য অপেক্ষার পালা।

এক সময়ে স্কুলে গিয়ে পৌছালাম। প্রতিদিনের মতো আজো আমরা নির্জনে বসে গল্প করছি এবং আগের রাতের স্মৃতি রোমন্থন করছি। আমি ছিলাম আধা শোয়া, মাথা ছিল তার কোলের ওপর। হঠাৎ এক বড়ভাই ওই অবস্থায় আমাদের দেখে ফেলে। সেই বড়ভাই–ই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ। বিনীতার বাবা মাকে সব কিছু সে বলে দিল।

ক্লাস নাইনে উঠে সে চলে গেল অন্য স্কুলে, আমি চলে গেলাম শহরে। শুরু হলো বিরহের পালা। শুক্রবারে বাড়ি আসতাম এবং গোপনে অন্য বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতাম। এমনি করে এসে গেল এসএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে আমাকে ডেকে সে বললো, রাজ্জাক, তুমি যদি আমাকে পেতে চাও তবে পরীক্ষার পরই শহর থেকে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। মহাচিন্তায় পড়লাম। কারণ তাকে আমার বাবা মা মেনে নেবে না। এবং তার বাবা মায়ের মেনে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমার এখন *শ্যাম রাখি না, কুল রাখি* এমনি অবস্থা। তাকে পেতে হলে আমার জীবনের সকল আশা ছেড়ে তাকে নিয়ে পালাতে হবে। থাকবো কোথায়? খাবো কি? এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম। অনেক চিন্তা–ভাবনার পর তাকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওখানেই আমার ভালোবাসার কবর রচনা হলো। নিজেকে সমাহিত করে, পরীক্ষার পর চলে গেলাম ঢাকায়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। দুই জনই ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলাম। আমি ভর্তি হলাম ঢাকায়। তার কোনো খবর নিলাম না।

এক বছর পর বাড়িতে এসে শুনলাম তার বিয়ে হয়ে গেছে। শুনে দুই চোখ জলে ভরে উঠলো কিন্তু তাকে দোষ দিলাম না। কারণ দোষ যা সবই তো আমার। তাই নিজেকে স্বার্থপর ভেবে সান্ত্বনা পেলাম। বন্ধুরা এসে সবাই বললো, চল কালি পূজা দেখতে যাই। কিছু না ভেবে আমিও রাজি হলাম। তাদের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই তাকে দেখলাম সেই লাল শাড়ি পরা। দেখে আমার পা যেন অবশ হয়ে গেল। সামনে চলতে পারছি না। আমাকে দেখেই বিনীতা খুব ধীরস্থিরভাবে আমার কাছে চলে এলো।

আমি মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছি।

সে আমার কাছে এসে প্রশ্ন করলো, কেমন আছো রাজ্জাক?

তার কথার কোনো জবাব দিতে পারলাম না। শুধু দুই চোখ জলে ভরে উঠলো।

অনেকক্ষণ পর জবাব দিলাম, না, তোমার চেয়ে ভালো নয়। কারণ তুমি স্বামী পেয়েছো, সংসার পেয়েছো, দুইদিন পরে সন্তানের মা হবে। সন্তান যখন মা বলে ডাক দেবে তখন আনন্দে বুক ভরে উঠবে।

এ কথা বলার পর খুব দ্রুত সেখান থেকে চলে আসি। তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। লাল শাড়ি পরা কোনো নারীকে দেখলে আমার দুই চোখ কান্নায় ভরে ওঠে এবং তার কথা মনে পরে।

গলাচিপা, পটুয়াখালী থেকে

ভবঘুরে

–মোহাম্মদ আবুল খায়ের রাসেল

আট বছর আগের কথা। আমরা তখন সপরিবারে মিরপুর ডিজিএফআই কলোনিতে থাকতাম। কলোনিতে লোডশেডিং নেমেছে অনেকক্ষণ হয়। ঘরে থেকে গরমে বেশ অস্বস্তি লাগছে। তাই সিড়ি ভেঙে নিচে নামলাম। কলোনির সামনের পিচঢালা পথের এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত চাদের আলোয় হাটাহাটি করছি। খানিক পর পর মৃদু বাতাস বইতেই বেশ ভালো লাগছিল আমার। শুধু আমি একা নই, কলোনির অনেক মানুষই পিচঢালা পথে, কলোনির পেছনে খোলা মাঠে এসে ঘুরোঘুরি করছিল। হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন ডাকলো পেছন থেকে।

এই যে ভাই, শুনুন।

থমকে দাড়িয়ে পাশ ফিরে চাইলাম। পচিশোর্ধ বয়সের এক মহিলা তার বুকে খুব যত্নের সঙ্গে একটি শিশুকে জড়িয়ে ধরে দাড়িয়ে আছে। তার পরনের কাপড়টির অনেকটুকু ছিড়ে গেছে। মহিলাটি অপরিচিত তো বটেই! কোনোদিন দেখিনি তাকে। কিন্তু এমন অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল যে, বুকের ভেতরটায় হঠাৎ দুঃখে হু হু করে উঠলো।

ভাইজান, আমার ইজ্জতটা ঢাকার জন্য একটা কাপড় যোগাড় করে দেন। ভাইজান, জেল থেকে আজই ছাড়া পেলাম। ভাইজান, একটা কাপড় জোগাড় করে দিতে পারলে আজই গ্রামে চলে যাবো। মহিলাটি কান্নাজড়িত স্বরে বললো।

কোথায় তোমার গ্রামের বাড়ি?

কুষ্টিয়ায়।

জেল থেকে আজই ছাড়া পেল? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

ভাইজান, আমার স্বামী রিকশা চালানোর কথা বলে ঢাকায় আসে। কিন্তু সে ঢাকায় আসার পর দুই মাস পর্যন্ত তার কোনো খোজখবর এবং তার তরফ থেকে কোনো চিঠিপত্র পাই না দেখে চার মাস আগে আমার ছেলেকে নিয়ে তাকে খোজার জন্য ঢাকায় চলে আসি। দুই দিন পর্যন্ত ঢাকায় তাকে অনেক খুজেছি। কিন্তু কোথাও পেলাম না আমার স্বামীকে। একদিন দুপুরে হঠাৎ আমাকে রামপুরার টিভি সেন্টারের কাছ থেকে পুলিশ ভবঘুরে কেসে ধরে নিয়ে যায়। চার মাস জেল খাটার পর আজ ছাড়া পেলাম।

তোমাকে ধরে নেয়ার আগে বিস্তারিত তাদের বলোনি?

বলেছি। কিন্তু আমার কোনো কথাই তারা তাদের কানে তোলেনি।

ঠিক আছে, তুমি দাড়াও, আমি একটু বাসা থেকে আসছি, বলেই বাসায় গিয়ে মাকে ঘটনাটি বলার পর তিনি তার পছন্দের একটি শাড়ি ট্রাংক থেকে বের করে দিলেন আমাকে। আমি শাড়িটি এনে তার হাতে দিতেই সে প্রচণ্ড খুশি হলো।

ভাইজান, আপনার উপকারের কথা আমার আজীবন মনে থাকবে।

কারেন্ট এলো। রাত তখন নয়টা বাজে। দ্রুত ঘরে ফিরে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। কিন্তু পড়ায় কোনো মনোযোগ ছিল না সেদিন।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

ত্রিস্মৃতি

–ফারাহ আজাদ দোলন

আশির দশকের কথা। আমি তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। অনার্স শেষ করে মাস্টার্সে উঠেছি। নিজেদের সিনিয়র প্রমাণের চেষ্টায় আমাদের ব্যাচে তখন শাড়ি পরার ভীষণ ধুম। পাচজন বান্ধবীর একটি গ্রুপ ছিল আমাদের। মুন্নী, সওদা, আমি সোশিওলজির, মনিকা, অঞ্জনা সাইকোলজির। ইউনিভার্সিটির বাস থেকে নেমেই আমার বাসা আগে পড়তো সবাই মিলে সেখানে আড্ডা জমতো।

মনিকার একটা অভ্যাস ছিল এর ওর কাছ থেকে এটা ওটা ধার করে পরা। আর ওর এ অভ্যাসের কারণে বাসায় ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো মায়ের কাছে আমাকে। পরস্থিতি এমন হলো যেন আমার সব শাড়িতেই ওর অধিকার। ভাগ্যিস, আমার উচ্চতা পাচ ফিট ছয় ইঞ্চি হওয়ায় আমার সালোয়ার কামিজগুলো পরতে পারে না। বাসায় আমার অবস্থান নাজুক হয়ে পড়লো। বন্ধুত্ব ভঙ্গের চিন্তায় নাও করতে পারি না। হ্যা করতেও গলা ব্যথা করে। বন্ধু বৎসল বলে আমার আবার সুনাম আছে। মনিকাও খুব ভালো বন্ধু। তবু ইদানীং ওকে দেখলেই অস্বস্তিতে ভুগী। কখন কি চায়? এর প্রতিকার কোথায় পাই।

একদিন এক শুভক্ষণে বড়বোনের কাছ থেকে উপহার পেলাম একটা শাড়ি। উপরের দিকে শাদা, নিচের দিকে নীল, তার মধ্যে লাল নকশা। এক কথার চমৎকার কম্বিনেশনের এক শাড়ি। আমি তো মহা খুশি। আনন্দ অবশ্য দীর্ঘ স্থায়ী হলো না মনিকার আবদারে।

দোলন তোর নীল শাড়িটা দে তো, একদিন পরে আসি।

বন্ধুত্বের দাবি রক্ষা না করে পারা যায়? তাই এক দিন, দুই দিন, তিন দিন খবর নেই। ওর বাসায় গিয়ে সরাসরি শাড়িটা চেয়েছিলাম।

শাড়িটা দিয়ে বললো, ইয়ে, শাড়ি একটু ছিড়ে গেছে, রিপু করা যাবে।

আমার সাধের নীলাম্বরীর দুরবস্থা দেখে হৃদয় ভেঙে গেল। ইংরেজি এল অক্ষরের আকৃতির হাতখানেক ছেড়া। তবে এখানেই সাঙ্গ হলো তার শাড়ি চাওয়া। এখন সে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের বৌ হয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। কে জানে স্বভাবটা বদলাতে পেরেছে কি না?

দুই.

জনৈক অফিসারের বোনকে দেখতে আসবে ছেলেপক্ষ। পরিবারটি আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ। পিতৃহারা বোনটিকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করার জন্য ভাইটি খুবই ব্যাকুল। জানালো ছেলেমেয়ে দুজন দুজনকে পছন্দ করেছে। বাবা মা এসে ফাইনাল কথা বলবে। বিয়েটা হবেই। বললো, আপা, আপনার দুই একটা শাড়ি দিন।

বেছে বেছে সোবার কলারের তিনটি শাড়ি দিলাম। একটি মিষ্টি সবুজ স্বর্ণ কাতান, একটি ফিরোজা কালারের মিরপুর কাতান, একটি পার্পল কালারের সিল্ক। কথা হলো এর মধ্যে পছন্দ মতো একটি মেয়েটি পরবে। আমি তার ফেস সাজাবো।

সময় মতো সেখানে পৌছে দেখি মেয়েটির পরনে তার ভাবীর বিয়ের কাতান। রঙটা বেগুনিঘেষা ম্যাজেন্টা। মেয়েটির রঙ ফর্শার কাছেই। তবে কেন, জানি শাড়িটা তাকে মানাচ্ছে না। ওরা আমাকে খুব বিনয়ের সঙ্গে জানালো আমার তিনটি শাড়িই নাকি মেয়েটি পরেছে।

কিন্তু কোনোটিই তাকে মানায়নি বলে সে ডার্ক কালারের কাতানটি বেছে নিয়েছে। তথাস্তু। মেয়েটিকে সাজিয়ে ছেলেপক্ষের সামনে নেয়া হলো। ইতিমধ্যে আমার ফিরোজা কাতানটি পরে মেয়ের ভাবী

লুবনা আসর আলো করে মেয়ের পাশে বসলো। তার পাশে মেয়েটিকে নিষ্প্রভ লাগছিল। বুঝলাম শাড়ি নির্বাচনে ভুল হয়ে গেছে।

ছেলেপক্ষ মেয়েটার সঙ্গে একা কথা বলতে চাইলে আমরা রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। লুবনা জানালো, এই ফাকে সে তার ছোট শিশুটিকে সেরেলাক খাইয়ে নেবে। যথারীতি লুবনা বাচ্চা কোলে নিয়ে খাটে বসে সেরেলাক খাওয়াতে লাগলো। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। কিন্তু হা হতোস্মি। সেরেলাক বাচ্চার মুখ থেকে পড়তে লাগলো আমার সাধের কাতানের গায়ে।

মা বললেন, দেখেছেন কি দুষ্টু, ঠিকমতো কি খায়? এখানে শেষ হলেও ভালো ছিল। না, আরো শোক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। খাওয়া শেষ করে বাচ্চাটি আমার শাড়ির ওপর বসেই হিসু পর্বটি সমাধা করলো। মা উঠে দাড়িয়ে কাপড়টি ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, আপার শাড়িটার বারোটা বাজিয়ে দিল। কথায় বলে, *অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।* মুখে হাসি এনে বললাম, আরে বাচ্চা মানুষ, ও কি বোঝে?

ইতিমধ্যে ছেলেপক্ষের তরফ থেকে খবর এলো তারা বিয়ে করছে না। এক মুহূর্তে আনন্দঘন পরিবেশে বিষাদ নেমে এলো। ভীষণ খারাপ মন নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

তিন.

নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্বামীর চাকরি সূত্রে ভুটানে ছিলাম তিন বছর। নানান পেশার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। তখন ইনডিয়ান ডিপ্লোম্যাট, আর্মি অফিসারের স্ত্রীদের বা নেপালি মহিলাদের দেখেছি বাংলাদেশি শাড়ির প্রতি আকৃষ্টি হতে, বিশেষত জামদানির প্রতি। এরা সবাই কিভাবে যেন জামদানির ভক্ত। এদের কয়েকজনের অনুরোধে ঢাকা থেকে জামদানি নিয়ে গিয়ে দিয়েছি। ওই শাড়িগুলোর এমনই প্রপাগান্ডা হলো যে, ইনডিয়ানরা যারা একটু নাক উচু তারাও একটু ভাব জমাতে চেষ্টা করতে লাগলো। ভেবে গর্ব হলো যে, জামদানি যেন এই ছোট দেশের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের মাথাটা উচু করে দিচ্ছে যেখানে কি না আমাদের অতি তুচ্ছ ভাবে ইনডিয়ানরা ।

আরেকটি ঘটনাও না লিখে পারছি না। তা হলো আমি থিম্পুতে যাবার পর শুনলাম আমাদের সম্প্রতি বিদায় নেয়া জনৈক রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী থিম্পুস্থিত এসব মহিলাদের শাড়ি প্রীতিকে কাজে লাগিয়ে নিজের পুরনো শাড়িগুলোর একটা গতি করে টুপাইস কামিয়ে নিয়েছেন। মনে হলো, সত্যিকার রাষ্ট্রদূত তাহলে কে, বাংলাদেশের শাড়ি, না বাংলাদেশের এম্বাসাডর?

বিভিন্ন দেশের ডিপ্লোম্যাটরা ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিক্রি করে জানতাম। তাই বলে পরনের কাপড়? যার যতো থাকে হায়, সেই আরো চায়।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নকল বৌ

– কেয়া

১৯৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ছিল আমার মেজবোনের বৌভাত। অনুষ্ঠান শেষে আলা দুলাভাই আমাদের বাসায় আসেন। আমরা চমৎকার করে তাদের জন্য বাসর সাজালাম। সব শালা–শালী সেই বাসর ঘরে নতুন দুলাভাইয়ের সঙ্গে প্রচুর ছবি তুললাম এবং গল্প করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। দুলাভাইকে নকল বৌ উপহার দেবো। কিন্তু নকল বৌটা কে হবে? যেহেতু রাতের ব্যাপার তাই কোনো মেয়ে রাজি হলো না। অবশেষে আমার খালাতো ভাই মনুকে রাজি করালাম। অবশ্য এতে লাভ হলো। মনু দেখতে হালকা–পাতলা এবং ফর্শা আমার বোনের মতোই।

আপাকে সব বললাম তো আপা বাসরে চলে গেলেন ও কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব পরিকল্পনা মতো বাথরুমে যাওয়ার নাম করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এবং আপার শাড়ি, চুড়ি সব পরিয়ে মনুকে দুলাভাইয়ের কাছে পাঠালাম। মনু বিশাল ঘোমটা দিয়ে রুমে ঢুকে সিটকিনি লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অন্ধকারে মশারির ভেতর থেকে দুলাভাই কিছুই বুঝলেন না। মনু নববধূর মতো চুপচাপ শুয়ে ঘুমানোর অভিনয় করতে লাগলো। তো যা হওয়ার তাই হলো। দুলাভাই তার নকল বৌকে কাছে টেনে ঘোমটা খুলে গায়ে হাত দিতেই চিৎকার করে ওঠে। কারণ মনুর চুল ছিল খুব ছোট এবং কম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাইট জ্বালান এবং লজ্জা পেয়ে যান। এবং মনু সেই শাড়িটা ওখানে খুলেই দৌড়। আর আমরা সবাই রুমে ঢুকেই দুলাইভাইকে বোকা বানিয়ে খুশিতে লাফাতে থাকি।

তখন দুলাভাই বলেন, তার নকল বৌটা আমরা কেউ হলে অর্থাৎ মেয়ে হলে ওনার নাকি কোনো আপত্তি ছিল না। এরপর আমরা সবাই অনেক হাসাহাসির পর চলে যাই এবং সেই শাড়িটা আপাকে পরিয়ে রুমে পাঠানো হয়। সেই আনন্দের দিনটা মনে পড়লে এখনো আমরা সবাই খুব মজা পাই। সেই শাড়িটা হয়তো পুরনো হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই দিনটা কখনো আমাদের কাছে পুরনো হবে না।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

অভিশপ্ত

–তৃণা

আমার প্রিয় রঙ আকাশি। হঠাৎ করে কেন জানি সবুজ রঙ ভালো লাগতে লাগলো। ৯৬ সালে ঈদুল ফিতর–এর দুই তিন দিন আগে বাড়ির সকলের কাপড়–চোপড়সহ আমার জন্য আমার স্বামী একটা সুন্দর সবুজ রঙ ও কালো পাড়ের সুতি শাড়ি নিয়ে এলো। শাড়িটা আমার খুব পছন্দ হলো। মনে মনে খুব খুশি হলাম। ভাবছি কবে আসবে ঈদের দিন।

অবশেষে প্রতীক্ষার পালা শেষ করে এলো ঈদের দিন। মনে মনে ঠিক করলাম, এখনি শাড়িটা পরে ভাজ নষ্ট করবো না। যখন ও আসবে তখন পরে ওকে সালাম করবো। ও আবার ঈদের নামাজ পড়ে একটু দেরি করে ফেরে।

তাই গোসল সেরে অন্য একটা নতুন সুতি শাড়ি পরে নামাজ পড়লাম। তারপর শুরু হলো দুপুরের রান্না-বান্না, সঙ্গে মেহমানদারী। এই করে বেলা দেড়টা বেজে গেল। এমন সময় ও এলো সাত আটজন মেহমান নিয়ে। কাজের ব্যস্ততার আর সেই শাড়ি পরা হলো না, ওকে সালাম করাও হলো না। তবু মনে মনে ভাবছি এই মেহমানরা বিদায় হলেই শাড়িটা পরবো।

এক সময় মেহমান চলে গেলে শাড়ি পাল্টাতে ঘরে গিয়েছি। এমন সময় ও বাইরের দরজা বন্ধ করেই আমার ঘরে এলো। আর রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে, ওই শাড়িটা পরোনি কেন?

ওর রাগের মুখে কিছুই বোঝাতে পারলাম না। আমি যাই বলি, ও আরো উত্তেজিত হয়। শেষে অবস্থা বেগতিক হয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগারাগি হলো দুজনের মধ্যে।

১৯৯৬-এর ঈদের তারিখটা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। মনে খুব কষ্ট পেলাম। সকাল থেকে কি যে আনন্দে ছিলাম আর কি হয়ে গেল। শখের শাড়িটা আর পরাই হলো না। ভাজ করা শাড়ি ভাজই থেকে গেল আলমারিতে। বসে বসে অনেক কাদলাম খোদা পাকের দরবারে। কি অপরাধ করলাম খোদা পাক, যে এমন হলো। শাড়িটা দেখি এবং যত্ন করে রেখে দিই। পরতে ভয় হয় কেন জানি!

এর মধ্যে কেটে গেছে অনেক দিন। ১৯৯৯-এ আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবো সবাই মিলে। বাচ্চারা খুব খুশি। সকাল আটটায় একটা মাইক্রোবাস নিয়ে রওনা হলাম সেই আত্মীয়ের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে। দুপুর একটায় পৌছালাম সেখানে। হঠাৎ করে আমাদের দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। ওদের দেখে আমরাও আনন্দিত। কিছুক্ষণ বসার পর শাড়ি বদলে আমার সেই শখের শাড়িটা পরে বাইরে এলাম। দেখি আমার ছেলেমেয়ে এবং ওদের আব্বা অবাক হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। বড় মেয়ে বললো, মা, এতোদিনে সেই শাড়িটা আবার পরলে?

আমি একটু হাসলাম। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল ৯৬-এর সেই ঘটনাটার কথা। একটু পরেই সব ভুলে মিশে গেলাম ওদের মাঝে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলে বের হলাম গ্রাম দেখতে। কি যে ভালো লাগছে! এখানকার বিশাল বিশাল ধানি জমি, সবুজ গাছপালা, ছোট বড় অসংখ্য পুকুর আর এখানকার সহজ-সরল মানুষের দেখে তা ভাষায় প্রকাশের অতীত। সন্ধ্যার সময় তাদের বাড়ি ফিরে চা পর্ব শেষ করলাম। তারপর শুরু হলো গল্প-গুজবের পালা। এভাবে কখন যে রাত নয়টা বেজে গেছে বুঝতেই পারিনি। আমাদের জন্য অনেক রকম রান্না হয়েছে।

সবাই গল্প করতে করতে হঠাৎ ওই বাড়ির দুই ভাইয়ের মধ্যে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলো। কিছুতেই থামানো যায় না। এক সময় তা মারামারিতে রূপ নিল। সে কি অবস্থা! আমরা সকলে হতবাক হয়ে গেছি। অনেক কষ্টে শান্ত করা গেল ওদের। মন খারাপ হয়ে গেল সকলেরই। আমার মনে হতে লাগলো এ বুঝি আমার শাড়ির গুণেই হলো। আমার স্বামী আর এক মুহূর্তের জন্যও থাকতে রাজি না। সে এক কথার মানুষ। কেউ তাকে বোঝাতে পারলো না।

এদিকে রাত একটা বেজে গেছে। খাওয়া-দাওয়াও কেউ করেনি। আমরা রাত তিনটায় বাড়িতে ফিরলাম। রাস্তায় শুধু মনে হলো কেন শাড়িটা পরলাম।

যত্ন করে রেখে দিয়েছি শাড়িটা। মেয়েরা বলে মা, শাড়িটা আমাদের দাও, কামিজ বানিয়ে পরবো। আমি বলি, মা, আমি এই শাড়ি কাউকে দিতে পারবো না আর পরতেও পারবো না। এ যে আমার বড্ড শখের শাড়ি।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

বোবা চিৎকার

– কামরুজ্জামান

১৯৯০ সালের কথা। বাবার চাকরি সূত্রে আমরা তখন থাকতাম বন্দর এলাকার ভাড়া করা বাড়িতে। আমরা তিন ভাই, এক বোন, বাবা, মাসহ মোট ছয়জনের পরিবার। সদস্য অনুযায়ী ঘরের রুম সংখ্যা ছিল কম। তাই গরমের সময় খুব কষ্ট হতো। শিক্ষক বাবার পক্ষে তখন এর চেয়ে ভালো বাড়ি ভাড়া নেয়া ছিল অসম্ভব। গরমে ঘরে থাকার উপায় নেই। ফ্যানের পাওয়ার ফুল দিয়েও যখন গরম দূর করা গেল না তখন আম্মা জানালা খুলে ঘুমাতে বলতেন।

এমনি এক রাতে জানালা খুলে বেশ আরামে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অসহ্য গরমে। বিদ্যুৎ নেই, ঘরময় অন্ধকার। জানালা খোলা। তাই চাদের আলোয় সামান্য কিছু দেখা যায়। পানির পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ প্রায়। পানির জন্য যখন বিছানা থেকে নামছি তখন দৃষ্টি পড়লো খোলা জানালায়। দেখি একটি লাঠি জানালা দিয়ে কাপড়ের আলনায় এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমার মুখে কোনো কথা আসছে না। আমার চোখের সামনে আলনার কাপড়গুলো একে একে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এক সময় জ্ঞান হারালাম।

সকাল বেলা মায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। আলনার সব শাড়ি কাপড় চুরির সংবাদ শুনলাম। চোর চুরি করে আলামত রেখে গেছে। লাঠির মাথায় কাটাতার লাগানো যন্ত্রটিও ফেলে গেছে। আমি আজ পর্যন্ত সেই রাতের কথা কাউকে বলতে পারিনি। হয়তো কোনোদিনই বলতে পারতাম না। যাযাদি *শাড়ি* সংখ্যায় যদি আমার এই লেখা ছাপা হয় তবে আমার মাকে সংখ্যাটি হাতে দিয়ে বলবো, আম্মা, আমি তোমার সেই ছেলে যে ঘরে বসে চিৎকার করে বলতে পারে না চোর সব নিয়ে গেল।

সাভার, সেনানিবাস থেকে

পোড়া

– সাকিব

আমি তখন খুব ছোট। সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে আজো কান্না পায়। একদিন আমার পরিবারের সবাই মিলে এক বিয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলাম। আমাদের পরিবারে ছিলাম আমি, আব্বু, আম্মু ও এক বড় বোন। আমার বড়বোন সেই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে নাচে অংশগ্রহণ করেন।

বিকেলে আমার মতো আরো ছোট ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলাম। লুকানোর জন্য মেয়েদের সাজার রুমে ঢুকে পড়ি। ঘরটা ছিল অন্ধকার। তার পাশেই একটি মোমবাতি জালানো। আমাকে খুজতে সেই রুমে কেউ আসেনি। ভাবলাম, শুয়েই থাকি। খাটে উঠে বসে দেখলাম নানান ধরনের শাড়ি এক জায়গায় রাখা আছে।

ওখান থেকে প্রথম শাড়িটা হাতে নিয়ে খাটের উপর রাখলাম। জানতাম না, শাড়িটা আমার বোনের। শাড়িটার ভাজ খুলে খাটের পাশে মোমবাতির কাছে রাখলাম। আর তখনই ঝাপটা একটা হাওয়া এসে শাড়িটার একটা অংশ মোমবাতির ওপর ফেললো। তাকিয়ে দেখি শাড়িটার একটা অংশ অনেকখানি পুড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পানি ঢেলে আগুন নিভালাম।

তখন শাড়িটা কোনো রকম গুছিয়ে রেখে ওখান থেকে চলে আসি। রাত নটার দিকে নাচের আসর বসলো। সবাই শাড়ি পড়ে নাচার জন্য রেডি হলো। তখন আমার আপুর শাড়ি দেখে সবাই হাসাহাসি করছিল। কারণ আপা সেই পুড়ে যাওয়া শাড়িটা পরে নাচছিলেন। তখন আপু খুব লজ্জা পেয়েছিলেন। পরে আপুকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। আপু এতোটুকু রাগও করেনি।

ডগরমোড়া, সাভার থেকে

স্বপ্ন পূরণ

–তৃপ্তি

পূর্ণিমার রাত। তার ওপর বাসার চারদিকে লাইটিং অর্থাৎ চারদিকে আলোয় আলোকিত। আমার জীবনের আজ এক কল্পনার জগতের বাস্তব রাত, বাসর রাত। আজ আমার পরনে লাল বেনারসি টকটকে লাল নয়, একেবারে রক্তের মতো লাল। আমার রক্তের মতো কথাটি বোধহয় ঠিক হলো না। আমার রক্ত তো ক্রমেই বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে। সেসব পরে বলছি। শাড়িটা এতো কারুকার্যময় যে, আমাকে পরীর মতো লাগছে। আচ্ছা আমি কি আদৌ এতো সুন্দর? নিজেকে নিজেই আয়নায় দেখি আর নার্সিসাসের মতো মুগ্ধ হয়ে বলি আমিই এ জগতের সেরা সুন্দরী। এই বেনারসি শাড়ি পরে বধূবেশে পালকিতে করে আজ শ্বশুরবাড়ি যাবো। কি যে আনন্দ লাগছে।

নিজেকে নিজ আবার যখন খুটিয়ে আয়নায় দেখি তখন উপরের স্বপ্নটা আমার নিমিষেই ভেঙে যায়। উপরের কথাগুলো সব আমার কল্পনা বা স্বপ্ন। হয়তো আর কোনোদিন আমার এই স্বপ্ন পূরণ হবে না। প্রায় প্রতিটি বাঙালি মেয়ে কৈশোর বয়সের পর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে একদিন সে লাল শাড়ি পরে বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি যাবে। তেমন করে এই স্বপ্ন পূরণ হবার দিন বোধহয় আমার নিয়তিতে জুটবে না। কারণ আমার দেহে কঠিন এক রোগ বাসা বেধেছে। আমার চোখের কোণে কালি পড়েছে। হাত–পায়ে পানি এসে ফুলে গেছে। মুখটা অস্বাভাবিক রকমের ফুলে আছে, মাথার চুলগুলো শীতের পাতার মতো এমনিতেই ঝরে পড়েছে। ডাক্তারেরা পৃথিবী থেকে বিদায়ের নোটিশ জানিয়েছে। তবুও মা, ভাই বোনের কি প্রাণান্তকর চেষ্টা আমাকে বাচিয়ে রাখার। প্রতি মাসে আমাকে চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েক মাস। তারপর আমার স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ নেবে

বিপরীতভাবে। অন্ধকার রাতে, চারদিকে শোকের ছায়া, তার ওপর আবার কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে, কারেন্টটাও চলে গেছে। আমার পরনে আজ লাল বেনারসির বদলে শাদা থান শাড়ি। চারদিকে ধূপ, আতর-গোলাপের সুবাস, আজো নিজেকে আয়নায় দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তার কি আর উপায় আছে? আজো আমাকে সবাই দেখতে এসেছে। আজো কি আমাকে সুন্দর লাগছে। আসলে লাল বেনারসি শাড়ির থেকে এই শাদা শাড়িতেই বুঝি আমাকে বেশ মানিয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরেই চার বেহারা পালকিতে করে আমার কল্পনার শ্বশুরবাড়ি পৌছিয়ে দিয়ে আসবে আমাকে। মুসলিম পরিবারের মেয়ে বলে লাল বেনারসি পরার স্বপ্নটি পূরণ হবে না মরণের পরেও। কিন্তু আমি যদি হিন্দু অবিবাহিত মেয়ে হতাম তবুও মরণের পরেও হয়তো বা আমার ইচ্ছার কিছুটা পূরণ হতো। শুনেছি হিন্দু কুমারী মেয়েরা যদি মারা যায় তবে তাকে বিয়ের বেশে অর্থাৎ লাল শাড়ি পরিয়ে, বিয়ের যাবতীয় সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করে তার কৃতকার্য সাধন করা হয়। এ জন্য মাকে প্রায় বলি, মা, আমি মারা গেলে আমাকে শাদা থানের বদলে লাল শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে বধূবেশে বিদায়ের কাজ সম্পন্ন করলে সামাজিক বা ধার্মিক দিক থেকে কি খুব ক্ষতি হবে? মা তখন আমার কথা শুনে চোখের জল মোছার জন্য দ্রুত অন্যখানে চলে যান।

আমার এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে না তা অনেক ভেবে চিন্তে মেনে নিলাম। কারণ নিয়তি বড়ই নিষ্ঠুর, তার উপর তো আর কারো হাত নেই। নিয়তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে কি শাড়ি পরে বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি যাবো। কিন্তু মানুষের এই সমাজে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর যখন যৌতুকের কারণে কোনো নারীর লাল শাড়ি পরে বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি যাবার স্বপ্নটা খান খান হয়ে ভেঙে যায় বা যৌতুকের অর্থ না দেয়ার সামর্থের কারণে বছরের পর বছর এই স্বপ্নটাকে বুকে নিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় পার করতে হয় তখন আমার এই অসুস্থ দেহের সুস্থ মনটাও অসুস্থ হয়ে যায়।

ভাবি আমার স্বপ্নটা তো পূরণ হবে না। কিন্তু ওদের স্বপ্নটা যদি পূরণ করতে পারতাম, ওদের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মধ্যে গিয়ে আমার স্বপ্নটা পূরণ হতো। আজ আমি এবং তুমি মিলে অর্থাৎ আমরা সবাই কি পারি না ওদের লাল শাড়ি পরিয়ে যৌতুকবিহীন শ্বশুরবাড়ির পথ করে দিতে?

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন

ধাপ সাগরপাড়া, রংপুর থেকে

পরী

– জালাল উদ্দিন

আমার চাচাতো বোন হাসিনা। আমার চাচা তার ফ্যামিলিসহ গ্রেট বৃটেনে থাকেন। হাসিনার জন্ম গ্রেট বৃটেনে। কয়েক বছর পর পর চাচা সবাইকে নিয়ে দেশে আসেন। হাসিনা তখন মনেপ্রাণে বাঙালি হবার চেষ্টা করে।

২০০০ সাল। চাচাসহ সবাই দেশে এসেছিলেন। তখন হাসিনার বয়স ষোল বছর।

আমাদের সিলেটের লোকেরা বৃটেনে কোনো প্রবাসী যদি থাকে কিংবা কোনো বাঙালি মেয়ের জন্ম যদি বৃটেনে হয় তবে এই ফ্যামিলির অনেকেই মেয়েটির বিয়ে ছোটবেলা ঠিক করে রাখে।

হাসিনার জন্মের পর চাচা আর আম্মা ঠিক করে রেখেছিলেন যে, হাসিনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। হাসিনাও সে কথা জানে।

হাসিনা দেশে আসার পর ওর জন্মদিন এসে গেল। ওর জন্মদিন তেরো ফেব্রুয়ারি। হাসিনার জন্য এমবি ক্লথ ষ্টোর থেকে একটি শাড়ি কিনলাম। কিনে ওকে গিফট দিলাম। আমার সামনে প্যাকেট খুলে শাড়ি দেখে খুশি হয়ে হাসিনা বললো, ওয়াও, আপনি শাড়ি এনেছেন! থ্যাংকস ফর ইট।

মৃদু হাসলাম। একটু পর হাসিনা মুখ কালো করে বললো! কিন্তু আমি যে শাড়ি পরা জানি না।

হেসে বললাম, এর জন্যই তো বলি, পৃথিবীর সব মেয়েদের শাড়ি পরার ট্রেনিং নেয়ার জন্য এশিয়া মহাদেশে আসা উচিত, বিশেষ করে বাঙালি মেয়েদের কাছে। বাঙালি মেয়েরা জানে, শাড়ি পরেও কিভাবে একটি মেয়েকে স্মার্ট দেখানো যায়।

হাসিনা মুখ বাকা করে বললো, শাড়ি স্পেশালিস্ট নাকি?

সে কথা উত্তর না দিয়ে বললাম, তাহমিনার কাছে যাও, ও তোমাকে পরিয়ে দেবে। তাহমিনা আমার বোন।

দশ পনেরো মিনিট পর হাসিনা শাড়ি পরে আমার সামনে এলো। হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললাম, হাসিনা, একটা কথা বলতে চাই, রাগ করবে না তো?

হাসিনা বললো, পাম্প মেরে কথা বলতে পারবেন না।

পাম্প নয় সত্যি, এখন তোমাকে একটি নীল পরীর মতো লাগছে। মনে হচ্ছে, পরীর দেশ থেকে তুমি ভুল করে মন রাজ্যে এসে পড়েছো।

হাসিনা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, কথা ছিল পাম্প মেরে কথা বলবেন না।

বললাম, পাম্প মেরে কথা বলিনি। তুমি আয়নায় নিজেকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে। জ্ঞান ফেরার পর নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন রাখবে, এ নীল পরী মানব রাজ্যে কোথা থেকে এলো?

হাসিনা টুপ করে আমার পায়ের কাছে বসে সালাম করলো। ও বললো, এ শাড়িটিতে যদি আমাকে সত্যি সত্যিই সুন্দর দেখায় তবে আমি এটি বৃটেনে নিয়ে যাবো। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সাজিয়াকে দেখাবো।

এর দুই মাস পরের ঘটনা। চাচাসহ সবাই চলে যাবেন। সব কিছু গোছানো হচ্ছে। আমার দেয়া নীল শাড়িটি গোছাতে গিয়ে হাসিনা দেখলো, শাড়িটির একটি অংশ ছিড়ে গেছে, হাসিনার চোখ–মুখ কালো হয়ে গেল।

হাসিনা বললো, এটি ছিড়ে গেল কিভাবে?

বললাম, রোদে শুকানোর পর ঘরে আনার সময় হয়তো তারে লেগে ছিড়ে গেছে।

হাসিনা কান্না কান্না কণ্ঠে বললো, এই নীল শাড়িটি আমার জীবনে প্রথম উপহার পাওয়া শাড়ি ছিল। এটি ছিড়ে গেল। আমার এতো ভালোলাগা শাড়ি!... ও কেদে ফেললো।

বললাম, আজই গিয়ে তোমার জন্য একটি শাড়ি নিয়ে আসবো। সেটি বৃটেনে নিয়ে যাবে।
হাসিনা বললো, কিন্তু সেটি তো উপহার হিসেবে প্রথম শাড়ি হবে না। দ্বিতীয় শাড়ি হবে।
প্রথম শাড়ি ছিড়ে যাবার দুঃখে হাসিনার কান্না কান্না মুখ আজো মনে পড়ে। খুব বেশি করে মনে পড়ে।

কামারকাপন, মৌলভীবাজার থেকে

সালাম

– আফতাব আহমেদ

তখন সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি।
নতুন পারিপার্শ্বিকতায় নিজেকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। কারো সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তখনো হয়ে ওঠেনি। এদিকে ক্লাস শুরু হলেও তা নিয়মিত ছিল না। পুরো সপ্তাহ জুড়ে দুটো বা তিনটি ক্লাস হতো। বাকি সময়টা অলস কাটাতে একদম ভালো লাগতো না। তাই আমি প্রায়ই এক সপ্তাহের জন্য হল ছেড়ে গ্রামের বাড়ি বরিশাল চলে যেতাম। তাছাড়া আমার ভালোবাসা তখনো শৈশবে। ভালোবাসার এক বছর পূর্তির দিনটিকে সামনে রেখে এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি চলে এলাম। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম একটা নীল সিল্ক শাড়ি প্রিয়াকে দেবো বলে। সিদ্ধান্ত নিলাম ঠিক যেদিন বর্ষপূর্তি হবে সেদিন দেখা করবো, আগে নয়। তাই শাড়িটা আগেই পাঠিয়ে দিলাম আর একটা চিরকুটে লিখে দিলাম শাড়িটা পরে নির্দিষ্ট স্থানে সময় মতো আসতে। এটা ছিল ওকে দেয়া আমার প্রথম এবং শেষ উপহার। আশ্চর্য হলাম আমার উপহার ওর হাতে পৌছানোর আগেই সে আমার জন্য এটা নীল শার্ট পাঠিয়ে দিল এবং চিরকুট লিখে দিল ওই নির্দিষ্ট দিনের আগে দেখা করবে না। উল্লেখ্য, নীল ছিল ওর প্রিয় রঙ আর ওর নাম ছিল নিলু।
অবশেষে আমার অধীর আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে সেই নির্দিষ্ট দিন–ক্ষণ এলো। দুজনে মুখোমুখি হলাম পরস্পরের উপহার দেয়া পোশাক গায়ে চাপিয়ে। এই প্রথম নিজের প্রেয়সীকে শাড়িতে আবিষ্কার করলাম। মনে হলো, এ শাড়িটা কেবল ওর জন্যই তৈরি হয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ নিবিড় সান্নিধ্য কাটানোর পর সময় হলো ফিরে যাবার।
হঠাৎ ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা কখনো তো তোমার বিনে অনুমতিতে কিছু করিনি। আজ একটা কাজ করতেই চাই। প্লিজ, বলো রাগ করবে না। আমি কথা দিলাম আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম ও নিচু হয়ে আমার পা ছুয়ে সালাম করছে। তৎক্ষণাৎ ওকে ধরে দাড় করিয়ে দিলাম এবং জড়িয়ে ধরলাম। এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। সংবিৎ ফিরে পেলাম যখন বুঝতে পারলাম ও পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো, মেয়েরা সাধারণত কাকে সালাম করে?
আমার স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে উত্তর করলাম স্বামীকেই মেয়েরা সালাম করে।
ও বললো – না, মেয়েরা যার কাছে নিজের মন প্রাণ অস্তিত্ব সপে দেয় তাকেই সালাম করে। আমিও তোমাকে আজ তা পুরোপুরি দিয়ে দিলাম।

ওর কথায় কি যে আনন্দ লাগছিল বলা কঠিন। কি করবো ভেবে না পেয়ে শাড়ির আচল দিয়ে ওকে ঘোমটা পরিয়ে দিয়ে ওর কপালে আলতো করে আদর করলাম। ওর চোখে পানি এসে গেল। ও ফিরে গেল।

সে ফিরে যাওয়াই হলো ওর শেষ যাওয়া। কিছুদিনের ব্যবধানে ওর গুরুতর লিভার সিরোসিস ধরা পড়ে। ঢাকায় এনেও অনেক দিন চিকিৎসা করানো হয়েছিল। আমি যতোবারই দেখতে গিয়েছি ততোবারই সে আমার দেয়া শাড়িটা পরে আমাকে সালাম করতো। আমি যতোবারই নিষেধ করতাম শুনতো না। সালাম করা শেষে কিছুক্ষণ আমার জড়িয়ে দাড়িয়ে থাকতো আর আদর করতে বলতো। আমি কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিতাম। কখনোই এর বেশি এগোতাম না। কারণ ও প্রচলিত দৈহিক প্রেমকে ঘৃণা করতো।

নয় মাস অসুখে ভুগে আমাদের সম্পর্কের ঠিক দুই বছর পূর্তির দিনে ও চলে গেল। সে মারা যাওয়ার আধঘণ্টা পরে আমি হাসপাতাল পৌছেছিলাম। গিয়ে দেখি আমার দেয়া শাড়িটা পরনে। আশ্চর্য! আমার একটুও কান্না পেল না, বরং মনে হলো এই বুঝি ও উঠে এসে আমাকে ছুয়ে সালাম করবে আর আমি ওর মাথায় শাড়ির আচলে ঘোমটা পরিয়ে ওকে আদর করবো।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

দুর্ঘটনা

–মেসবাহ উল ইসলাম

তার দুই চোখে লজ্জা আর ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় ইতস্তত করছেন। কিন্তু চিৎকার না করে চুপ হয়ে গেলেন। এভাবে পথের মধ্যে চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গেলে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঘটনাগুলো বেশ উপভোগ করছিলাম।

কয়েক বছর আগের কথা। আমি আর আমার বড়বোন রিকশা করে খুলনা নিউ মার্কেট থেকে বাসায় ফিরছিলাম। আমাদের রিকশা *ঝিনুক* সিনেমা হলের সামনে পৌছাতেই ভিড়ের মধ্যে দেখলাম, মোটরসাইকেলের পেছনে বসে থাকা এক ভদ্রমহিলা অসতর্কতার কারণে তার শাড়ির আচল জড়িয়ে গেল পেছনের চাকায়। এবং মহিলা চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে পড়ে লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার মাঝে পড়ে গেলেন। লাটিমের লেততি যেমন ঘুর্ণনকারীর হাতে থেকে যায় এবং লাটিম ঘুরতে থাকে, ভদ্রমহিলার শাড়ি মোটর সাইকেলের সঙ্গে রয়ে গেল, তিনি ঘুরতে ঘুরতে পথের মধ্যে বসে পড়লেন। সীতার বস্ত্র হরণের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য না হলেও এ যে তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় সেটা হয়তো বলা যাবে।

নিষ্ঠুর মোটরসাইকেল যে ভদ্রমহিলাকে নব্যসীতার জন্ম দিল এ কথা বললে হয়তো ভুল হবে না। কারণ মহিলার পরনে শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট। এ অবস্থা দেখে আমার পাশে বসে থাকা বড়বোন রিকশা থামিয়ে এক লাফে পৌছে গেলেন মহিলার পাশে। এবং তড়িঘড়ি করে আমার বোনের পরনের বোরখা খুলে মহিলাকে পরিয়ে দিয়ে লজ্জা নিবারণ করালেন। বোরখা পরতে অনভ্যস্ত

মহিলার প্রথমে আপত্তি থাকলেও অবস্থার বাস্তবতায় তা মেনে নিলেন। মহিলাকে আমরা দুই ভাইবোন তুলে নিয়ে আবার নিউ মার্কেটে ঢুকলাম। আর রিকশাচালককে দাড় করিয়ে রাখলাম মোটরসাইকেলচালক স্বামী বেচারার ফেরার অপেক্ষায়। ভদ্রমহিলাকে আমরা বললাম, ভাবী, আর একটি শাড়ি কিনতে পারেন অথবা ওই বোরখা পরেও যেতে পারেন।

ভাবীকে নিয়ে আমরা শাড়ি পছন্দ করলাম। তিনি নতুন শাড়ি পরে যখন ড্রেসিং রুম থেকে বের হলেন তখন ক্যাপটেন (ভদ্র মহিলার স্বামী) একটি ময়লা শাড়ি হাতে হাজির হলেন।

তাকে দেখামাত্রই ভাবী অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। এমন বেআক্কেলের মতো মোটরসাইকেল চালাও, কিছুই খেয়াল করবে না? আর্মি পারসন হয়েও তুমি এতো বড় বেআক্কেল আগে বুঝতে পারিনি। আমার এতো দামি শাড়িটা কি হাল হয়েছে।

ভদ্রলোক নিউ মার্কেট থেকে প্রায় চার কিলোমিটার পথ নতুন রাস্তার মোড় পৌছানোর পর দুইজন সিপাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে তারা যখন বলছে, স্যার, আপনার মোটরসাইকেলে শাড়ি পেচানো কেন? তখন পেছনে খেয়াল করে ফিরে এসেছেন।

শাড়ি পরে মোটরসাইকেল চড়ার ক্ষেত্রে অসাবধানতার এমন দুর্ঘটনার খবর হয়তো অনেক শোনা যায়। কিন্তু এ থেকে আমাদের নারী সমাজ শিক্ষা নেবে কি না সেটাই প্রশ্ন।

সোনাডাঙ্গা, খুলনা থেকে

খুত

– লিসা

পৃথিবীতে যতো রকম পোশাক আছে তার মধ্যে শাড়ি এক অনন্য সুন্দর পোশাক। শাড়ি প্রতিটি বাঙালি নারীর কাছেই প্রিয়। আমার কাছেও প্রিয় এবং খুবই প্রিয়। আমার সংগ্রহে অনেক রকম শাড়ি আছে। সব সময় চেষ্টা করি রুচিসম্মত শাড়ি কিনতে। মনে হয় সফল হই। কারণ শাড়ি পরলে সবাই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়।

সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় লম্বা কিছুটা বেশি হওয়ায় শাড়ির ডিজাইন মনে হয় বেশি ফুটে ওঠে। আমি যখন কোনো শাড়ি পরে বাইরে বের হই তখন থেকেই শুরু হয় বঞ্চনা। যখন কেউ বলে বাহ, বেশ সুন্দর তো শাড়িটা! ব্যাস হয়ে গেল আমার বঞ্চনার শুরু। কারণ তারপরই কোনো না কোনোভাবে শাড়িটা ছিড়ে যায় বা খুত হয়ে যায়। জানি না কেন এমন হয়। আমার সংগ্রহে যতো ভালো শাড়ি আছে তার সবগুলো কোনো না কোনোভাবে খুত হয়ে আছে। তারপর কোনো ভালো শালকোরের দোকান থেকে রিপু করে আনা।

বিজ্ঞানের এই যুগে নজর লাগে এমন কুসংস্কার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু নিজের বঞ্চনার কথা ভেবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। জানি না আমার এ বঞ্চনার শেষ হবে কি না, রিপু করা শাড়ি পরার হাত থেকে রেহাই পাবো কি না?

নওমহল, ময়মনসিংহ থেকে

সুখ

– শেখ শামিল বাসির রাজীব

বরাবরই মেয়েদেরকে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে ভালোবাসি। তখন আমি ক্লাস টেন–এর ছাত্র। তখন থেকেই মেয়েদের প্রতি আলাদা আকর্ষণ জাগতে শুরু করেছিল। আমার বন্ধু জুয়েলের সাহায্যে তাদের পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেয়েটির নাম ছিল রূপা। সে ছিল আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এক ভদ্র মেয়ে। আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র। প্রায়ই আমরা স্কুল ফাকি দিয়ে যশোহর উপশহর পার্কে গিয়ে চুটিয়ে প্রেম করতাম। বাসা থেকে অবশ্য আমাদের প্রেমটা ধরা খেয়ে গিয়েছিল। তারপরও আমরা পারিবারিক সকল বাধা অতিক্রম করে দেখা করতাম। আমাদের মধ্যে ছিল গভীর ভালোবাসা। এমনকি আমরা দুজন দুজনকে একদিনের জন্য না দেখে থাকতে পারতাম না।

রূপা পার্কে বসে মাঝে মধ্যে বলতো, রাজীব, এ পার্কে ভাইয়া প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে আসে। যদি আমাদের দেখে ফেলে তাহলে তোমাকে প্রচণ্ড মারবে। তার চেয়ে তুমি একটা ভালো জায়গা দেখো যেখানে আমাদের ভয় থাকবে না।

একদিন রূপাকে জানালাম, নিরাপদ একটা জায়গা আছে।

সে তখন খুব খুশি হয়ে বললো, কোথায় জায়গাটা?

জানালাম আমার বাড়ির কথা। মা–বাবা কয়েকদিনের জন্য ইনডিয়ায় যাচ্ছেন। বাড়ি পুরো ফাকা থাকবে। তবে একজন কাজের মহিলাকে রেখে যাচ্ছে আমার সঙ্গে। কিন্তু একটা শর্ত আছে, তোমাকে ওই দিন একটি সুন্দর নীল শাড়ি পরে আমাদের বাড়ি আসতে হবে। কারণ তোমাকে নীল শাড়িতে দারুণ মানাবে।

তখন সে বললো, রাজীব, বাসা থেকে শাড়ি পরে বের হলে সন্দেহ করবে। বললাম, স্কুলে আসার সময় শাড়িটি ব্যাগে করে আনবে এবং পরে আমার বাসায় এসে পরবে।

পরের দিন সে ঠিক সময় আমার বাড়ি এসে হাজির। এর আগেই কাজের বুয়াকে কিছু জিনিস আনতে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। তাই রূপাকে বাসায় ঢোকাতে অসুবিধা হয়নি। আমরা একটা ঘরে গিয়ে দরজা দিলাম। এরই মধ্যে আমাদের কাজের বুয়া বাসায় এসে গেছে। অবশ্য বুয়াটি কিছুই বুঝতে পারেনি ঘরে দরজা দেয়ায়। কিছুক্ষণ কথা বলার পর রূপাকে বললাম, কই, শাড়ি পরবে না?

রূপা বললো, শাড়ি তো অবশ্যই পরবো। কিন্তু মিস্টার, একটু এখান থেকে যেতে হবে।

আমিও নাছোড়বান্দা, তার শাড়ি পরা দেখবোই। তাই তাকে চালাকি করে বললাম, আমি যদি এই ঘর থেকে বের হই তাহলে বুয়া ঘরে ঢুকতে পারে।

কোনো দিক খুজে না পেয়ে আমাকে বললো, তাহলে পেছনে ঘোরো আমি শাড়ি না পরা পর্যন্ত একদম তাকাবে না।

তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করছিল তাকে প্রকৃত রূপে দেখতে। তাই নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে হঠাৎ করে ঘুরে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু ঘুরে তাকিয়ে যা দেখলাম তা বর্ণনা দেয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই। একজন নিরাবরণ নারী আমার চোখের সামনে দাড়িয়ে আছে যা নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং শাড়িটি দিয়ে নিজের বুকে চাপা দিয়ে বললো, আমি জানতাম, তুমি এই রকম ফাজলামি করবে।

আস্তে করে রূপার কাছে গেলাম এবং ছোট্ট করে একটা চুমু তার ঠোটে একে দিলাম। রূপা সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বন্ধ করে ফেললো। কিন্তু আগে একটা চুমু দিতে গেলে যে রকম বাধা দিতো তা আজ আর দিল না। তারপর যখন মরিয়া হয়ে তাকে কাছে পেতে চাইলাম তখন সে বললো, আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখবে না।

নিজেকে একটু সংযত করে বললাম, অবশ্যই দেখবো। রূপা সেই দিন এক এক করে আমার সামনে প্রথমে ব্লাউজ, তারপর পেটিকোট এবং শেষে নীল রঙ–এর শাড়িটি পরলো। তখন তাকে কি যে সুন্দর লাগছিল যা অন্য কোনো মেয়েদের তুলনায় অতুলনীয়। আমাকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটা দুষ্টুমি হাসি দিয়ে বললো, মেয়ে কখনো দেখোনি!

তাকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললাম, দেখেছি, তবে তোমার মতো নয়।

এরপর শুরু হলো আমার পাগলামি। যখন পাগলামি শেষ হলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম রূপার খোলা দেহের ওপর পরম শান্তিতে শুয়ে আছি। সেই মুহূর্তে রূপা আমাকে বললো, রাজীব, তুমি আমাকে আজ যে সুখ দিলে তা যেন সারা জীবন দিতে পারো।

রূপার কথা আমি রেখেছি। আজ রূপা আমার স্ত্রী। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঘরে তুলতে পারিনি। কারণ বিয়েটা এখনো গোপন রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে ঠিকই আমার ঘরের বৌ হিসেবে উঠবে। যাহোক, ওই দিন জেনেছিলাম শাড়িটি তার মায়ের। যে নীল শাড়ির জন্য রূপাকে আমি এতো কাছে পেয়েছি সেই নীল শাড়িটি রূপা খুব যত্নে তুলে রেখেছে।

যশোহর সার্কিট হাউস, যশোর থেকে

অজানা

–ফাতেমা আক্তার রিনা

শাড়ি কারা পরে? কেন পরে? কিভাবে পরে? এই সবের উত্তর ও যখন জানতো না, বুঝতো না সাথী। তখন থেকে শাড়ি নিয়ে পারাপারি করতো। এই ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে সাথী। আচ্ছা, যে মেয়েটি চার হাত কাপড় সামালাতে পারে না, তিন হাত লম্বা কাপড়ও পরার বয়স বা স্বাস্থ্য কোনোটাই হয়নি সে মেয়ের বারো হাত লম্বা কাপড় পরা তো বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই না।

নাকি? তবে সে কিছু না বুঝলে ও এটুকু বুঝতো যে, কাপড় পরলে বৌ হওয়া যায়। যদিও বৌ–এর অর্থ কি ও বুঝতো না। এই না বুঝে বারো হাত শাড়ি নিয়ে বৌ সাজতে গিয়ে অনেক দিন অনেক বকা

খেতে হয়েছে। মায়ের, চাচির, মামির, এমনকি ভাবীরও। তবে যে যতো বকাবকি করুক বা মারুক না কেন, তবুও শাড়ি পরা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারেনি। সময় সুযোগ পেলেই হলো চুপিচুপি সাথী পরবেই আবার চুপিচুপি সে শাড়ি খুলেও রেখে দিতো। তখন অবশ্য ধরা পরতো না। ধরা পরতো তখনই যখন শাড়ির মালিক শাড়ি পরতে যেতো। তখন শাড়িতে ময়লা দেখেই বুঝে যেতো। এই আকাম কে করতে পারে। সাথীকে জিজ্ঞাসা করলে যে অস্বীকার করবে তাও না। কারণ নিজের অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করবে, শাড়ি আমি পরেছি।

এক সময় মেয়েটি বড় হয়েছে, সব কিছু বুঝতে শিখেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শাড়ি পরার পরিবর্তনের প–ও হয়নি। উল্টো তার শাড়ি পরার অভ্যাস বা শখ তীব্র হয়েছে। বাড়িতে যার জন্য মার্কেট থেকে নতুন শাড়ি আনা হোক না কেন, প্রথমে সাথীকে শাড়িটি পরতে দিতে হবে। সে প্রথম শাড়ি পরবে, বৌ সাজবে। তবে বড় হবার পর শাড়ি পরার ভেতরে একটু পরিবর্তন হয়েছে তা হলো, আগে শাড়ি পরে বৌ সেজে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতো। এখন নতুন শাড়ি পরে বৌ সেজে এক এক করে ঘরে সবাইকে পা ধরে সালাম করবে। এবং একটানা দুই দিন নতুন শাড়িটি পরবে। পরে ময়লা করার পর প্রকৃত শাড়ির মালিক শাড়িটি ফেরত পাবে, তার আগে নয়।

সাথীর শাড়ি পরা নিয়ে অনেক সময় ঘরের সবার ভেতর খুব মজা হতো! আনন্দ, হাসাহাসিও কম হতো না। তবে মাঝে মধ্যে কেউ আবার বিরক্তও হতো। কোনো মহিলা আত্মীয়স্বজন বাড়িতে বেড়াতে এলে তাদের নতুন শাড়িগুলো সাথীর পরার হাত থেকে রক্ষা পেতো না। সে যতো কৌশলই করুক না কেন, সাথী তা বের করে পরবেই। কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলেও সাথীর একটাই আবদার, সে শাড়ি পরে যাবে। যদিও সবার দৃষ্টিতে তার শাড়ি পরার সময় হয়নি।

সালোয়ার কামিজ পরারই উপযুক্ত সময়। কিন্তু যে মেয়ে এতোদিন শাড়ি পরে মিছে মিছে বৌ সেজে আসছিল, যার এতো দিনের আশা, স্বপ্ন, শখ বাস্তবে মনের মানুষের বৌ হবার দ্বারপ্রান্তে এসে সব হিসাব উল্টো–পাল্টা করে ফেললো। যে মেয়েটি সেই ছোটকাল থেকে শাড়ি গায়ে পরে আসছিল, সে সাথী সত্যিকারের বৌ সাজার জন্য কাছে এসে শাড়ি গায়ে না পরে, কোমরে না পেচিয়ে পেচালো নিজের গলায়। বৌ না হয়ে কার ওপর অভিমান করে কেন জানি কাউকে কিছু না বলে নীরবে চলে গেল এই সুন্দর পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য, চিরবিদায় নিয়ে পরপারে। স্বপ্ন তার স্বপ্নই রয়ে গেল। স্বপ্ন পূরণ হলো না। আর কেন যে তার স্বপ্ন পূরণ হলো না, কেন সে চলে গেল কেউ তা আজো জানলো না।

ছাগলনাইয়া, ফেনী থেকে